খাদান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

সূচি

কালো মেয়ের কথা

কয়লাখনি অঞ্চলের জীবন আর আদিবাসী শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছি আমি। টাটকা তথ্য সংগ্রহ করতে জেলায় জেলায় ঘুরছি। পুরুলিয়া শহরে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর বিভু মুখার্জি আমাকে আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। সেখানে পেলাম আদিবাসী জীবনের নানা তথ্য। কিন্তু আমার আরো অনেক কিছু জানা দরকার। পরের দিন গেলাম বান্দোয়ান ও বলরামপুরে। সে রাতটা বান্দোয়ানে রইলাম। পরদিন ফিরে এলাম পুরুলিয়া। বাঁকুড়া শহরেই থাকে আমার আরেক বন্ধু মধুসূদন চ্যাটার্জি। সে অবশ্য আগেই বলেছিল, দাদা, চলে আসবে বাঁকুড়ায়। অনেক তথ্য পেয়ে যাবে।

সেদিন দুপুরের ট্রেন ধরে চলে গেলাম বাঁকুড়া। স্টেশনে এসেছিও মধু। বলল, চল দাদা, তোমার জন্য জেলা পরিষদের বাংলো বুক করে রেখেছি। রিকশায় চেপে চলে গেলাম সেখানে। বিকেলের দিকে বাংলোয় এলেন দ্বিজপদ মাহাতো। বয়েস প্রায় ষাট। গায়ের রঙ যাকে বলে একেবারে কালো কুচকুচে।

দ্বিজপদবাবু বললেন, মধুই আপনার কথা বলল। আপনি নাকি আদিবাসী শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন?

হ্যাঁ, তা-ই করতে চাইছি। তবে এই বিশাল সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংগ্রহ করা পরিশ্রম ও সময়ের ব্যাপার—আমি বললাম।

দ্বিজপদবাবু বললেন, বটেই তো। এই কাজ তো সহজে বিনা পরিশ্রমে হবে না! যথেষ্ট শ্রম দিতে হবে।

সে আমি দেব!—আমি দ্বিধাহীন।

ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যায় জেলা লাইব্রেরিতে আসুন। কিছু বইপত্র দলিল-দস্তাবেজ পেয়ে যাবেন। গ্রন্থাগারিক স্বপন ঘোষ মাইডিয়ার লোক। আপনি ওঁর সাহায্য পাবেন।

দ্বিজপদবাবুর কথামতো সন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলা লাইব্রেরিতে গেলাম। পরে গেল মধুসূদন। চা-তেলেভাজা খেতে খেতে, ধুলো ঘেঁটে, আমার কাজে লাগবে, এমন অনেক কিছুই পেলাম। স্বপন ঘোষ খুব সাহায্য করলেন।

মনটা খুশি। পরের দিনটা পুরো লেগে যাবে তথ্যগুলো টুকতে। কিছু কিছু ফটোকপিও করা যাবে।

চলে গেল আরও একটা দিন। ভেবেছি, এখান থেকে আদ্রা হয়ে আসানসোল যাব। ওখানে আছেন নিশীথকুমার ঘোষ। তিনি এর আগে আদিবাসীদের শিল্প-সাহিত্যের বেশ কিছু সন্ধান দিয়েছিলেন। এবার ঠিক করেছি, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই আদিবাসী-সাঁওতাল গ্রামগুলোয় ঘুরব।

তা মধুসূদন বলল, এখানে যখন এসেছই, তখন ছান্দারটা ঘুরে যাও। এখানে উৎপল চক্রবর্তী 'অভিব্যক্তি' নামে আদিবাসী শিল্প-সংস্কৃতির একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। মনে হয় উৎপলদা এ-ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আমি কি আর সে সুযোগ ছাড়ি! চলে গেলাম ছান্দার। দেখা হল উৎপল চক্রবর্তীর সঙ্গে। আগাগোড়া শিল্পী মানুষ। প্রাণঢালা আতিথেয়তা আর প্রাণখোলা অনেক অনেক কাজের কথা পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, এখানকার কাজ একদিনের নয়। পরে আসতে হবে। তবুও জানলাম অনেক। উৎপলবাবু স্থানীয় যেসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'অভিব্যক্তি' সংগঠনটি চালাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁদের গান শুনলাম। আবৃত্তি শুনলাম। শুনলাম আদিবাসী নাটকের সংলাপ। প্রাণবন্ত একটা দিন কেটে গেল। পরদিন গেলাম বিষ্ণুপুর। এখানকার মল্লরাজাদের অসামান্য কীর্তি টেরাকোটার মন্দির। এগুলি এখন আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দেখাশোনা করে। এ এস আই-র বিষ্ণুপুরের অধিকর্তা হচ্ছেন এস কে দত্ত। ইনিও আমার পূর্বপরিচিত।

এর আগেও আমি বিষ্ণুপুরে এসেছি। তখনই আলাপ হয়েছিল এস কে দত্তের সঙ্গে। উনি আমাকে টেরাকোটার মন্দিরগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন তার ইতিহাসও। সুবীরবাবুই বললেন, আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে আপনাকে রানিবাঁধ যেতেই হবে। কেন না, ওখানে জনসমষ্টির চুয়াল্লিশ শতাংশ আদিবাসী মানুষ আছেন। অবশ্য এই কথাটা আমাকে আগেই বলেছিলেন বর্ষীয়ান আদিবাসী নেতা নকুল মাহাতো আর লোকসংস্কৃতির গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অতএব একবার রানিবাঁধ যাওয়া দরকার।

দুই

এতদিন দিব্যি বাসে-ট্রেনে ঘুরছিলাম। লাইব্রেরিতে বসে আরামসে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। রানিবাঁধে এসে সেই সুখ গেল। ধূলিধূসরিত পথে নামলাম এবার।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিভিন্ন আদিবাসী ক্লাবগুলোয় এত কিছু জানার আছে, আমি তা ভাবতেই পারিনি।

নতুন নতুন তথ্য আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। ওদের বাঁধনা পরব, বাহানৃত্য, করম নৃত্য, পূর্ণিমার রাতে নাচের সেইসব অসাধারণ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি।

সেদিন সকালে বেরিয়েছি। রানিবাঁধ থেকে হাঁটতে হাঁটতে মাইল চারেক ভেতরে দু'তিনটে গ্রামে ঘুরলাম। যেমন মাঝডিহা, খেজুরিয়া ইত্যাদি। কথা বললাম ওদের সঙ্গে। ওদের অনেক বিষয় খাতায় টুকে নিলাম। টেপ রেকর্ডারে ধরলাম ওদের গান।

যখন ফিরতি পথ ধরলাম, তখন বাজে বেলা আড়াইটে। টুকটাক এটাসেটা খেয়েছি। আজ ভারী খাবার পেটে পড়েনি। আমার ঝোলা ব্যাগে এক প্যাকেট বিস্কুট ছিল। তাও শেষ। বেশ খিদে পেয়েছে। গ্রামের ভেতরের মোরাম রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। এই রাস্তায় বাস চলে না। রিকশা বা ভ্যান রিকশাও চোখে পড়ল না।

ফিরতি পথে আড়াই মাইলের মতো হেঁটেছি মনে হল। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে। রাস্তায় একটা টিউবওয়েল থেকে জল খেতে গিয়ে বুঝলাম, খালি পেটে জল পড়তেই পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে।

বেলা সাড়ে চারটে বাজে। রুক্ষ পাহাড়ি ভূমিতে এই পড়ন্ত বেলাতেও ছাতিফাটা রোদ্দুর। আর আমি পারছিলাম না। এখনো রানিবাঁধ মাইলখানেক রাস্তা তো বটেই।

হাঁটছি। পা আর চলে না। পেটের মধ্যে কুরুক্ষেত্র চলছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব তো? সামনের রাস্তাটা গেছে ধূ-ধূ এক প্রান্তরের ওপর দিয়ে। তারপরে দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছিল।

ওফ! কি করে পার হব এই মাঠ? ভাবতেই বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। হেঁটে চলেছি যেন তপ্ত কোনো চাটুর ওপর দিয়ে।

ওঃ, মা গো! আর পারি না।

প্রান্তর শেষে গ্রামখানির সবুজ গাছপালা দেখে মনে আশা জুগিয়ে তুললাম। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই কিছু খাবারদাবার পেয়ে যাব আশাকরি।

সত্যিই মরুভূমিতে যেন মরূদ্যান পেলাম। গ্রামের লাগোয়া ছোট্ট একটা বাজার। সবজি-টবজি বিক্রি হচ্ছে। খাবার মতো একটু কিছু খুঁজছিলাম আমি।

সামনেই দেখি একটি কালো আদিবাসী মেয়ে একটা বেশ বড় সাইজের পাকা পেঁপে নিয়ে বসেছে। ছোট্ট মেয়ে। বারো-চোদ্দ বছর বয়েস হবে। কিছু সজনে, ক'টা শিম আর গাজরও আছে তার পাশে।

আমি পড়ি কি মরি পেঁপেটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, এটার দাম কত রে খুকি?

আট ট্যাঁকা বটে।

পাঁচ টাকায় দিবি না?

না বটে।

ছ'টাকায় দিবি তো?

নায়, নায়!

বলিস কি! একটুও কম করবি না?

নায়। মা বুল্যেছে আট ট্যাঁকায় বিচত্যে। কুন্যো কম হব্যাক লাই। এত্য বড় পেঁপে। বাজারে পন্‌রো ট্যাঁকা দাম হব্যেক বটে।

তা পেঁপেটা সত্যি বড়ই বটে। আমি আট টাকাতেই কিনে নিলাম। ঝোলা ব্যাগে ছুরি ছিল। তাই দিয়ে পেঁপের খানিকটা কেটে খেলাম। দারুণ! সত্যিই দারুণ মিষ্টি। বেশ ভাল জাতের পেঁপে।

পেটটা একটু ঠাণ্ডা হল। কিন্তু বড় পেঁপের কতটা আমি খেতে পারব? চার ভাগের এক ভাগও খেতে পারিনি। বাদবাকি পেঁপেটা বিক্রেতা মেয়েটিকে দিয়ে দিলাম।

এই নাও খুকি। বাদবাকিটা তোমরা বাড়িতে খেয়ে নিও।

নায়, নায়। আম্যি লিব্যাক না। ট্যাকা ফিরত হব্যেক লাই।

আমি হেসে বললাম, তোমাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। আমি এমনিই দিচ্ছি।

নায়, নায়। কেনে লিব্য?

আমি যতই বোঝাই না কেন, সে যেমন বেচার সময় এক পয়সাও কম করেনি, আবার মাগনা জিনিসটা যে কিছুতেই নিতে রাজি নয়। আমি অনেক করে বললাম। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড়।

মেয়েটির বাড়ি ছোট্ট বৈকালিক সেই বাজারের পেছনেই। আমাদের দু'জনের তর্কাতর্কির শব্দ শুনে মাটির বাড়ির দরজা খুলে মেয়েটির মা বেরিয়ে এল। তাঁর গলায় উৎকণ্ঠা।

কী হঁল্য বট্যে?

কিন্যে লিয়ে ই টো ফিরত দিচ্ছে বটে বাবু।

কেনে, কেনে?

আমি তখন বললাম ব্যাপারটা। আমি ঝোলা ব্যাগে যদি কাটা পেঁপেটা ভরে নিই, ব্যাগও নষ্ট হবে, এটি খাওয়াও যাবে না।

কিন্তু খুকির মায়েরও একই কথা—না বাবু, তুমার জিনিস আমরা লিব্য কেনে? পোইসা লিছি। উ জিনিস তুমার বটে অ্যাখন।

আরে বাবা, পেঁপেটা নষ্ট হবে! এটা বুঝছ না কেন? আচ্ছা কারবার তো!

নায় বাবু নায়। ভিখ না লিব্য আমরা। গতর খাঁইট্যে কাজ কইরব বটে।

বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল আমার মস্তিষ্কে। এই কথায় আমি ধাক্কা খেলাম। জোর ধাক্কা। আমি ভেবেছি কী? আমি শহরের মানুষ। তথাকথিত উচ্চবর্ণ। এতক্ষণ কী চোখে দেখেছিলাম এঁদের? সত্যিই কি আমার সমান মর্যাদা দিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম? আমার উদ্বৃত্ত জিনিসটুকু এঁদের দেবার মধ্যে এদের প্রতি আমার করুণা প্রকাশ পায়নি কি?

ভিক্ষা হোক, দয়া হোক আর করুণা হোক—যাই বলি না কেন, এই আদিবাসী কিশোরী ও মায়ের চোখে তা স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছে। একেবারে নিক্তির সূক্ষ্ম মাপে। আমার মজ্জাগত প্রচ্ছন্ন অহং ওরা ধরে ফেলেছে। আমার অহং আমি ধরতে পারিনি। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক ভাবছিলাম। সমাজের নিচুতলায় পড়ে থাকা অসমবয়সী দুই নারী আমার চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিল। হ্যাঁ, শিখতে হল। ওদের কাছেই শিখতে হল।

আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সেই কালো মেয়েটি আর সেই কালোবর্ণ মায়ের কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, এক গ্লাস জল খাওয়াও তো! তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে তেষ্টা পেয়ে গেল। ওঃ, বাপ রে বাপ!

হাসিমুখে একটা পেতলের গ্লাসে জল এনে দিল সে। ওরা বুঝেছে, ওদের ঝগড়া সার্থক হয়েছে।

তৃপ্তি করে জল খেয়ে বললাম, ঘরে ভাজা মুড়ি আছে তোমাদের?

হাঁ, হাঁ। আছ্যে বটে।

তা হলে একটা ঠোঙায় মুড়ি দাও তো খানিকটা। সন্ধের পরে রানিবাঁধে পৌঁছে খেয়ে নেব।

কালো বউটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ফের বেরিয়ে এল খানিকক্ষণ বাদে। হাতে প্লাস্টিক প্যাকেটে মোড়া মুড়ি। তার মধ্যেই তাল পাটালির টুকরো।

ওরে বাবা! তাল পাটালি দিয়েছ। আমার দারুণ প্রিয়!

একটু তাল পাটালি ভেঙে খেলাম। তারপর মুড়ি-গুড় শুদ্ধ প্লাস্টিক প্যাকেটটা ভরে নিলাম আমার ঝোলা ব্যাগে। এবার বললাম, খুকি, নাও। পেঁপেটা ঘরে নিয়ে রেখে এস তো।

মেয়েটি এবার পেঁপেটা নিল। মেয়ের মা জিজ্ঞেস করল, বাবু তুমার ঘর কুথ্যাকে বটে?

আমি বললাম, কলকাতায়। তা তোমার মেয়ের নাম কী?

মেয়েটির চটপট জবাব, আদুরী বাগদি। আম্যার বাবা কয়লা খাদানের লোডার। আম্যি সিক্সে পড়ি বটে।

তাই নাকি! আমার ছেলেও সিক্সে পড়ে। এক্কেবারে সমান সমান।

ওদের চোখে-মুখে উজ্জ্বল হাসি। আমি বললাম, এবার তা হলে আসি আদুরীর মা!

হাঁ, হাঁ। সাঁঝ হয়্যে যেঁনছে বটে।

আমি রওনা দিলাম রানিবাঁধের দিকে। সন্ধ্যার অপূর্ব আলো তখন এই মালভূমির প্রান্তরে-অরণ্যে আর জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে।

সবুজ রুইদাস

বসন্ত এসেছে। শীত গেল এই ক'দিন আগে। মালভূমির অরণ্য অঞ্চলে শিমূল ফুটেছে। ফুটেছে পলাশ। টকটকে লাল। একেবারে আগুন। সে আগুন মানুষের মনের মধ্যে খেলা করে। মেয়ে মানুষের মনের মধ্যেও খেলা করে। এদিকে ওদিকে কয়লাখনি। মাঝে লাল রাস্তা। লাল ধুলো ওড়ে। লাল শিমূলের রঙিন বার্তা নিয়ে যায় লাল ধুলো। সবুজ রুইদাস খনি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে। খনি শ্রমিক। দেখলেই বোঝা যায়। মাথায় হেলমেট। খাকি হাফ প্যান্ট, কয়লার রঙে ধূসরিত গেঞ্জি পরা। কোমরের বেল্টে লাগানো রয়েছে খনির ভেতরে গ্যাস পরীক্ষা করার ফ্লেম সেফ্‌টি ল্যাম্প। হাতে ক্যাপল্যাম্পের হেডপিস। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ির পথে চলেছে সবুজ রুইদাস।

'সাতটা ছিলার জনম দিয়া
ভাত দিবি নাই বইলে,
তুই মুনস্যা ডুবে মর গা
দামুদরের জলে।'

গ্রামের নাম গাঙপুর। সবুজের বাবা রামু রুইদাস এই গ্রামেরই মানুষ ছিলো। এমন গান গাওয়া পেয়েছে সবুজ বাবার কাছ থেকেই। সেও ছিলো খনি মজুর। রামু রুইদাসের কণ্ঠে গান ছিলো জন্মগত। রামুর টুসু ভাদু আর বাউল গান—ভরা বর্ষার দামোদরের মতো ঢেউ তুলতো মানুষের মনে। ফাঁক পেলেই গান

গেয়ে দু'পয়সা রোজগার করতো সে। মরে গেছে রামু রুইদাস। কিন্তু মরেনি তাঁর গান। এখানকার বনস্থলীর শিমুল, পলাশ, মহুয়ার ডালে-পাতায় সে গানের সুর এখনো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

সেই গান, আর সেই সুর ধরে রেখেছে ছেলে সবুজ রুইদাস। বাড়ি ফেরার পথে, গেরুয়া ধুলো ওড়া রাস্তায়, তাঁর গানের সুর ভাষা পেতে থাকে। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর মালভূমির উচ্চাবচ জমি ধরে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে। তারপর কোন টিলায় ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—

তুই মুনস্যা ডুবে মর গা
দামুদরের জলে রে ভাই!
দামুদরের জলে।

আরো দূর টিলা থেকে সে গান ফের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—

দামুদরের জলে রে ভাই-ই-ই-ই-ই!
দামুদরের জলে- এ-এ-এ-এ!

লাল রাস্তা পাকা বাস রাস্তায় এসে উঠেছে। এখানে মোড়ের মাথায় গোটা দশ-বারো গুমটি দোকান ঘর। মনোহারি, মুদি আর মিষ্টির দোকান ছাড়াও রয়েছে তিনটে চায়ের দোকান। সন্ধেবেলা সবজি আর মাছের ছোট বাজার বসে এখানে। কাছাকাছি গ্রামের মানুষ বিকেল বিকেল আসে বাজার করতে। সন্ধেয় ফিরে যায়। তেমনই কয়েকজন চা খাচ্ছিলো দোকানের বেঞ্চিতে বসে। ওরা ডাকলো সবুজকে।

সবুজ ভাই! খাদ থিক্যে ছুট্টি মিলল বটে?

হঁ।

তুমার গান ত শুনা যেঁন্ছে বটে দূর থিক্যে।

অই আর কি। মন মানে না। গান গাঁঞিছি।

ভারী উদাস কণ্ঠ গ তুমার। চা খাও বটে?

বুলঅ। —বলে বেঞ্চিতে বসে পড়লো সবুজ।

আরে গগনদাদা! আদা দিঁইয়ে আচ্ছা পেশাল চা কর গ বটে।

তারপর সবুজ, তুমার খবর বল হে!

সব কয়লা খাদ বন্দ হঁঞি যেঁন্ছে। উপায় কি হব্যে? ভাবছি কেবল।

হামি দো মাহিনা বেকার। —চায়ে চুমুক দিয়ে বললো প্রৌঢ় বাত্তিলাল সিং।

ই সি এল ষড় কইর‍্যছে বটে। সব খাদ বন্দ কর দিব্যেক।

সবারই চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। এসব নানা কথায় সবারই কপালে ভাঁজ পড়ে। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, জামুড়িয়া, কুলটি সব জায়গাতেই কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। সবুজদের খনিতে মাঝেমাঝেই আগুন জ্বলে উঠছে। কোন নিরাপত্তার চেষ্টা নেই ম্যানেজমেন্টের। বিপদ মাথায় নিয়ে সবুজ রুইদাসের

মতো আরো খনি শ্রমিকরা রোগ ডুলি খাদে নামছে। এদিকে শুন্‌শান হয়ে যাচ্ছে খনি অঞ্চলের জনপদ। জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লাখনির প্রবেশ পথ। যেই পথ দিয়ে খনির ভেতরে বাতাস ঢোকে, সেইসব চিমনিগুলো নিথর দাঁড়িয়ে থাকে এখন। অযত্নে খনিমুখে পড়ে আছে সব লোহার খাঁচার হেডগিয়ার। তার মাথার ওপরের চাকা আর ঘোরে না। এক সময় ওই চাকা ঘুরতে ঘুরতে মানুষ ভর্তি চানক খনির ভেতর গিয়ে নামাতো।

এইসব ভাবতে ভাবতে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বাত্তিলাল, রমেশ, বুধিয়া, ফিরোজ, পবনদের বুকের ভেতর থেকে।

আরে, ছোড়ো ভেইয়া! যো হোগা, ওহি হোগা। হ্যায়ই জিন্দেগি ভর। একঠো গানা তো গাও সবুজ ভাই!

তা বটে। এক ট গান ত শুনাও সবুজ তুমার উদাস কইর্ঠে।

সবুজ তাই গান ধরলো শেষ পর্যন্ত। বহু পুরনো দিনের গান। কয়লা খনি শুরুর যুগের কথা এ-সব।

'রেল গাড়িতে গোমো যাব
কাজ কইরতে সিখানে,
লতুন বৌকে ছেঁড়ে যেইতে
মন কিছুতেই না মানে।
বৌ যেন গ ভরা ভাদর
কার কাছে ব রাইখ্যে যাই?
সাপের কাছে ব্যাঙ রাইখতে
মন কি কেউ সবুর পাই?
ভাই আমায় বইলে দাও গ
অ্যাখ্যন আমি কি করি?
গত্তে পইড়্যে ছটফটানি
সাপ ধরি না ব্যাঙ ধরি।'

বাহ্‌ বাহ্‌ বাঃ। জমিয়ে দিয়েছ গ সবুজ ভাই।

আর এক ট পেশাল চা হঁইয়্যে যাক বটে।

হাঁ, হাঁ। বহোৎ আচ্ছা। ফিন একবার চায়ে হো যায়।

তারপর অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসে। চড়াই-উৎরাই মালভূমির দিকচক্রবালে পশ্চিম সূর্যের লালাভ রশ্মি ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামে। সবুজ রুইদাস বাড়ি ফেরে।

দুই

সবুজের বউয়ের নাম সারথি। নিজে পছন্দ করে, ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সবুজ। পুরুলিয়ার গ্রামের মেয়ে সারথি। ভাদুটুসু ভালোই গাইতো। বিয়ের পর সবুজ বলেছিল, তুই আমার এত্তোদিন ভালবাসার ছিল্যি বটে। ইবার এক্কেবারে পাকাপাকি বউ। ইবার গলা খুইল্যে গান করবি হাঁ। তবে না লোক বইলব্যাক, তুই আমার পাকাপাকি বউ বটে। ঠিকা বউ লইস।

সবুজ-সারথির বিয়ের পর দেখতে দেখতে এগারো বছর কেটে গেছে। সুখে-দুঃখে কাটছে দিন। ওদের আজও ছেলেপুলে হয়নি। তাই দু'জনের মনের মধ্যেই আছে চাপা দুঃখ। কিন্তু ওরা কাজের মানুষ। ঘরে বসে দুঃখ করার সময় কোথায়?

সারথি ঘরে মোটা মোটা করে আটার রুটি বানাচ্ছিলো। ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড, যা সংক্ষেপে ই সি এল—একে একে কয়লাখনি বন্ধ করে দিচ্ছে।

তাই কর্মব্যবস্তার মধ্যেও চাপা শঙ্কা ওদের মনে। এখানে বিজলি আলো আছে। সবুজ বাইরে কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে এলো। বসলো বউয়ের পাশে।

জোর চেষ্টা পাঁইয়েছে।

শুনেই সারথি তাড়াতাড়ি করে পেতলের ঘড়া থেকে এক গ্লাস জল এনে দিলো। জল খেয়ে হাঁফ ছেড়ে সবুজ চুপ করে বসলো খানিকক্ষণ। সারথি ঘরের এটা সেটা কাজ কর ছিলো। তার রাতের খাবার তৈরি করা হয়ে গেছে। মোটা মোটা রুটি আর আলু পটলের তরকারি।

সবুজের গোমড়া মুখ দেখে সারথি জিজ্ঞেস করলো, কি হঁইয়েছে বটে?

কিছু লয়। মন আর মানতি চায়না রে সারথি। চাদ্দিক শ্মশান হঁই যেন্ছে।

ছাড়ান দাও বটে। একটা মিঠা গান গাও দিনি।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সবুজ। জন্ম গায়ক সে। চোখ বুজে সামনে রাখা পেতলের ঘটিতে চাটি মেরে তাল ও সুর ভাঁজতে লাগলো। গুনগুন করলো কিছুক্ষণ। তারপর শুরু করলো—

কলমি হাঁটার চচ্চড়িতে
বেগুন দিও ভাদু,
শুকনা ভাতে দিব্বি খাব
দেইখবো তুমার যাদু ......
ও সারথি, দেইখবো তুমার যাদু গ,
দেইখবো তুমার যাদু ....।

অ্যাই! অ্যাই! কি গান হঁইনছে বটে, হাঁ! —হা—হা করে হেসে গড়িয়ে পড়লো সারথি।

সবুজ তখন পেতলের ঘটিটায় চাটি মেরে তাল ঠুকে যাচ্ছে।

কিন্তু খনি শ্রমিকের এই সুখ আর এই আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে বড় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলো ওরা দু'জন। আকাশে জ্যোৎস্না ঢালা চাঁদ ছিলো। ছিলো হাজারো তারার আকাশ জমিন। তবুও পৃথিবীতে নানা অশান্তি নামে। সেখানে মানুষ বড় অসহায়।

মাঝ রাত পেরিয়ে সেই রাত আবার কদমতালে এগোচ্ছিলো ভোরের দিকে। রাত এখন আড়াইটে-তিনটে হবে। আর দেড় দু'ঘন্টা হলেই তো ভোর। দিনের আলো ধুইয়ে দেবে তখন এই মাটি, গাছপালা, লাল রাস্তা, উচ্চাবচ ভূমি।

অদ্ভুত এক অস্পষ্ট আওয়াজ ঘুমন্ত সবুজের কানে এসে শুধুই ধাক্কা মারছিলো। বারবার ঘুম ভেঙে যেতে চাইছে। কিন্তু সবুজের বড্ড গাঢ় ঘুম। চট করে ভাঙে না। অদ্ভুত সব শব্দাবলী তার কান থেকে স্নায়ুপ্রবাহে ভেসে মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল। শেষে পর্যন্ত ঘুম ভেঙে গেল সবুজের। বহুদূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার পৌঁছলো তার কানে।

অ সারথি! উঠ্। বাইরে কিছু হঁইয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লো সারথি। —কী, কী হঁইয়েছে?

তক্ষুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। অনেক মানুষের কথার আওয়াজ।

অ সবুজ! অ সবুজ! উঠ্ বটে! জলদি উঠ!

হি হল্যো বটে? —সবুজ ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিলো।

তুদের খাদে আগুন জ্বইলছে বটে।

সবুজ ও সারথি দু'জনেই কথাটা শুনে চমকে যায়। সর্বনাশের কথা। দরজা খুললো সবুজ। ওদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের খনিরই শ্রমিক দীনেশ, জটাধারী, দিবাকর, রমেশ, আফসার, ব্রিজলাল, এমন আরো অনেকে।

ছুটতে ছুটতে আইলম হেথ্যাকে।

মাইন জ্বল রহা হ্যায়। চলো জলদি। ফায়ার ব্রিগেডকো, পুলিসকো ভি বুলানে পড়ে গা।

দ্রুত জামা-প্যান্ট গায়ে চড়িয়ে সবুজ সকলের সাথে ছুটলো খনিতে।

শুধুই লকলকে আগুনের শিখা। খনিমুখে হেডগিয়ারের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বীভৎস কালো ধোঁয়া ওপরের দিকে উঠছে। ছোটাছুটি, পুলিস, দমকল— কোনো কিছুতেই কিছু হলো না। খনি অভ্যন্তরের সে আগুনকে কোন যন্ত্রপাতি দিয়েই বাগ মানানো গেল না। ভোর হলো। বেলা বাড়লো। দুপুরের রোদ্দুর তীব্র হয়ে

উঠলো। সময় কোথা দিয়ে চলে গেল, কেউ জানে না। রাতে কেউ খনিতে ছিল না। এই যা রক্ষে। কেউ মারা যায়নি।

কিন্তু খনিমুখ থেকে ওঠা সেই কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া এই খনির বারোশো শ্রমিকের জীবনকে ভবিষ্যতের জন্য অন্ধকার ঢেকে দিলো। বন্ধ হয়ে গেল আরো একটা কয়লাখনি।

তিন

জ্বলতে থাকা কয়লাখনির মুখে চলে এসেছে বারোশো পরিবারের বৌ-বাচ্চা, বাবা-মায়েরা। এসেছে সারথি রুইদাস, লছমী সিং, ফুলওয়ারি মিশির, ষোড়শী বাগদি—এমন আরো অনেকে।

দুপুরের পর একে একে সব বাড়ি ফিরতে লাগলো। সবুজ আর সারথিও ফিরলো ওদের কোয়ার্টারে।

ঘরে ঢুকে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লো সবুজ।

কি হল্যো? সিনান করো বটে। আমি ভাত বঁসাইনছি।

কি হব্যে খেঁইয়্যে? খাওয়া আর জুটব্যাক লাই ইবার।

সে দিখ্যা যাবে পরে। সবুজকে জোর করে ঠেলে তুলে সারথি স্নান করতে পাঠালো। নিজে স্টোভ জ্বেলে চালে ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে দিলো।

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হলো, প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। সবুজ গুম মেরে বসে রইলো খাটিয়ায়। —এরপর এরপর কি হবে?

সারথি অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো, কি হল্যো? ঝিম মেরে বঁইসে আছ্য কেনে?

সনসার ত ডুইবব্যে ইবার।

কেনে ডুইবব্যে?

ডুইবব্যাক লাই? মাইন ত বন্ধ হল্য। টাকা আইসবে কুথ্যা থিক্যে?

তা কি হঁইয়েছে? তুমার বাবা ত গান কইরে রুজগার কইরতেন?

হাঁ।

তুমিঅ কর। আমি থাইকব তুমার সাথ্যে। দু'জনে গান গাইব বটে। টুসু, ভাদু, বাউল!

সারথির কথায় একটু নড়েচড়ে বসলো সবুজ। ভাবলো, ব্যাপারটা কি সত্যিই করা সম্ভব! বাবা রামু রুইদাসকে অনেকে গান গাইতে নিয়ে যেতো। খাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু রোগজার হতো তাতে।

কি ভাবছো বটে?

ভাবছি, গান গাইব্য?

হাঁ, হাঁ! কিছু ত্য কর।

দেখ্যাই যাক। কি হয়!

হব্যে, হব্যে। ভাবছ কেনে অত?

দেওয়ালের একেবারে মাথায় রামু রুইদাসের একতারাটা টাঙানো ছিলো। সে দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সবুজ। চুপ করে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বৌকে ডাকলো।

সারথি!

কি বটে?

একতারাট' লাবাবি?

হাঁ।

তা লি' লাবা। ধুলা ঝাঁইড়্যে সাফা করি।

সারথি দেওয়ালের হুক থেকে একতারাটা নামিয়ে আনলো। রাখলো সবুজেব পাশে। সবুজ রুইদাস সেই একতারার ধুলো ঝেড়ে তাকে সাফসুত্রো করতে লেগে গেলো। একতারার তারে মাঝে মাঝেই আঙুল লেগে টুংটাং শব্দ উঠছিলো। সেই শব্দে শিহরণ জাগছিল তার শরীরে। চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো রামু রুইদাসের পাথরকোঁদা শরীরটা।

আসনপিঁড়ি হয়ে মেঝেতে বসেছে সবুজ রুইদাস। তার বাঁ হাতে একতারা ডান হাতের তর্জনি আর মধ্যমা ছুঁয়ে যাচ্ছে একতারার তার। গুন গুন করে সুর তুলছে সবুজ। চোখ বুজে আছে সে।

সারথি ঠিক ওর মুখোমুখি বসে আছে। ওর দৃষ্টি সবুজের দিকে। সারথির মনে হচ্ছিলো, এ যেন রামু রুইদাস। বাবা রামু রুইদাসের মতো একই রকম ভঙ্গিতে একতারাটা ধরেছে সবুজ।

গুনগুন করে সুর ভাঁজছে সবুজ। বহুক্ষণ ধরে তা দেখছিলো সারথি। চারদিক চুপচাপ। পৃথিবীর বুকে কে যেন পাষাণভার চাপিয়ে রেখেছে।

এক সময় নড়েচড়ে বসলো সারথি। সবুজের গুনগুন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেও কণ্ঠ তুললো।

এবার সবুজ চোখ চাইলো। সারথির গলায় গুনগুন সুর। সবুজ হাসলো। সে হাসি সারথির মুখেও।

তারপর দ্বৈত কণ্ঠের সুর গানে ভাষা পেয়ে জ্যোৎস্নালোকিত মালভূমির রুক্ষ্ম কঠিন প্রান্তরে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

আপনজন

দিনটি ছিলো সূর্যকরোজ্জ্বল। চনাই-উতরাই জমিতে সূর্যের দারুণ দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছিলো। ফলে উত্তাপ ছিলো পাথুরে মাটিতে। এই উত্তাপ খনি এলাকার মানুষের মনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। কোয়ার্টার থেকে কুনুস্তোরিয়া কয়লা খাদানের দিকে যাবার পথে তাই গান ধরেছে দিবস রুইদাস।

'ঝুকনবালা রান্ধ্রে ভাল্য
কুল্যে বেগুনে,
ফুক দিঁইয়ে মুখ পুড়ে গেল্য
তুষের আগুনে।
বিরি কলাইয়ের ডাল,
বাসি কর্য়ে রাখবি ঝুকন,
দিবস খাব্যে কাল।
ঝুকনবালা, ঝুকনবালা,
তুঁহার লেগ্যে প্রাণট্য হামার
হঁইয়ে যেনছেঁ ফাল্যা ফাল্যা!'

দু'হাতে তালি বাজিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডিউটিতে চলেছে দিবস। পরনে খাকি রঙের ঢোলা হাফপ্যান্ট, আর কয়লার রঙ মাখানো মোটা কাপড়ের গেঞ্জি। অনেকটা পথ। দিবস রুইদাস কখনো জোরে বা কখনো গুনগুন করে গেয়ে চলেছে

সেই গান—'ও হো-হো ঝুকনবালা, ঝুকনবালা/তুহার লেগ্যে প্রাণ ট' হামার/হঁইয়ে যেনছেঁ ফাল্যা ফাল্যা।' দিগন্ত বিস্তৃত উচ্চাবচ মাঠঘাটপথ দিবসের মনটাকে মাতিয়ে দিচ্ছিলো। সেই মাতন গান হয়ে যাচ্ছিলো তাঁর দরাজ কণ্ঠে।

প্রাণচঞ্চল কুনুস্তোরিয়া খনি পিট। এইমাত্র একটা শিফটের কাজ শেষ হলো। দলে দলে শ্রমিকরা এক এক করে উঠে আসছে খনির সুড়ঙ্গ থেকে।

পিটের সীমানার মধ্যেই একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তার নিচেটা শান বাঁধানো। সেই ছায়ায় গাদাগুচ্ছের খনি মজুর আড্ডা জমিয়েছে। দিবস এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বুল্য হে দিবস। কেমন চইলছ্যে বটে? বৃদ্ধ সুধাকান্ত বেসরা বিড়ি ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করল।

তুমাদের-হামাদের আর তফাত কি? কাজ কামের যা অবস্তা। পটাপট সব খাদান বনদো হঁইয়ে যেঁনছে!

আরে অ সাজন! ইধার আরও ভাই! বিড়ি লাও!

সুধাকান্ত পুরনো দিনের মানুষ। চুপচাপ থাকতে পারে না। ছোটবড় সবার সঙ্গে তাঁর ভাব। ঘর-সংসারের খবর নেওয়া, চারটে সুখ-দুঃখের কথা বলা—এসব না থাকলে জীবনে আর রইলো কি? দরাজ হাসি হাসতে পারে সুধাকান্ত বুড়া। বলে, খাদানের লেবর বটে হামলোগভ। আজ আছ্যি, ত কাল মইবতে হব্যাক! দু'দিন্যের লেগ্যে মন ট' তো সাফ রাখ্য জী!

কথায় কথায় ছড়া কাটে সে—

'লাউ ডিংলার ঝাল,
খুদ সিদ্ধ ভাত,
তাত্যেই খুশি সাপুড়ে
সাপুড়ে, মুখে ঢুকাস হাত।'

হ্যাঁ, লাউকুমড়োর তরকারি আর খুদের ভাতই সাপটে সুপটে খেয়ে মহা আনন্দে আছে সুধাকান্ত বেসরা। সাজন মাঝির হাতে একটা বিড়ি গুঁজে দিয়ে বলে, লাও লাও! চারঠো টান দিইয়ে খাদে নেইম্যে পড়হ্।

অশ্বত্থ গাছের নিচে এমনই চলমান জীবন এখন। রুক্ষ্ম পাথুরে ভূমির এইসব মানুষের মধ্যে এমনই উচ্ছল প্রাণের ছড়াছড়ি।

খনি পিটের হেড গিয়ারের বিরাট মাপের ইঞ্জিন শোঁ-শোঁ করে নামছে-উঠছে। হেড গিয়ারের চাকা ঘুরেই চলেছে। টব ভর্তি কয়লার ডুলি উঠে আসছে। খালি টবগুলো নেমে যাচ্ছে। পাশেই জমছে কয়লার পাহাড়।

দিবস! এস যে! এদিকে! —খনির ইলেকট্রিক্যাল-মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নৌশাদ আলি অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। আলি হাতের ইশারায় দিবসকে ডাকছিলেন। দিবস ছুটে গেল। —কি হলো আলি সাহেব?

এই শিফটে তুমি নামছো?

হ্যাঁ।

সুড়ঙ্গে নারান মাণ্ডি অসুস্থ বোধ করছে। তুমি এই ট্যাবলেট আর জলের বোতল নিয়ে নামো। ওষুধটা খাইয়েই ওপরে তুলে নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি!

কুথ্যাকে আছ্যে নারান?

সাত নম্বর ডিপের দশ নম্বর লেভেলে আছে।

দিবস আর দেরি না করে অফিসের পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো। নির্দিষ্ট তাক থেকে নিয়ে ক্যাপল্যাম্প লাগিয়ে নিলো মাথায়। তার ওপর মাইনিং হেলমেট। পায়ে গলিয়ে নিলো তার নির্দিষ্ট মাইনিং শু। ক্যাপল্যাম্পের নম্বর দেখে অ্যাটেনডেন্ট খাতায় তার নামে পাঞ্চ হলো সেই নম্বর।

বডি চেকারের শরীর তল্লাশির পরেই সে দ্রুত ডুলিতে উঠে পড়লো। ডুলি নামতে শুরু করল। ডিপে নামতে নামতে এক দুই তিন নমবর লেভেলের মুখের আলোগুলো ফেলে আসছে ডুলি। এভাবেই আলো-অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথে সাড়ে চারশো ফুট নিচে এসে ডুলি থেমে গেল। ঘন কালো দেওয়াল চারধারে। দিবস ডুলি থেকে নেমে দশ নম্বর লেভেল ধরে এগলো। ওর ক্যাপল্যাম্পের আলো কালো কয়লার দেওয়াল আর সুড়ঙ্গ পথকে ইতস্তত আলোকিত করে এগিয়ে চলেছে। কিছুটা এগিয়েই সে খনি মজদুরদের কোলাহল শুনতে পেল। যেখানটায় ফার্স্ট এইড বক্স আর স্ট্রেচার থাকে, সেখানটায় অনেকগুলো ক্যাপল্যাম্পের আলো বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। দিবস উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, নারান মাণ্ডি কুথাকে আছ্যে বটে?

সুড়ঙ্গে প্রতিধ্বনি তুললো সেই কথা। বেশ কয়েকজনের সম্মিলিত উত্তর ভেসে এলো।

ইখ্যানে বটে।

দিবস এগিয়ে গেল।

স্ট্রেচারে শুয়ে আছে নারান মাণ্ডি। পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

কি হঁইএঞছে?

পেটে বেথা। বমি।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ই ওষুদ 'টো দিল্য বটে। খাঁওয়াইএঞ দাও।

উয়াঁকে উপ্যরে নিতি হবে তো?

হাঁ। উপ্যরে ডাক্তার ডাঁকাইনছে বটে।

আরো একবার বমি করলো নারান। মুখটুক ধুইয়ে ওষুধ খাওয়ানো হলো তাকে। দিবস এবার বললো, চলো, চলো হে। ই বদ্ধ জায়গায় উয়ার দম বন্ধ হঁইন যাবে বটে।

অসুস্থ নারান মাণ্ডিকে নিয়ে ডুলি ওপরে উঠতে শুরু করেছে। ডিপের লেভেল থেকে ফের খাড়া সুড়ঙ্গ। একটু করে আলোর পরেই বেশি সময় নিকষ অন্ধকার। ওরা চাইছে, কত তাড়াতাড়ি নারানকে ওপরে নিয়ে যাওয়া যায়। দিবস ছাড়াও আরো পাঁচজন রয়েছে ডুলিতে।

আশি ফুট খানেক ওঠার পরই ডুলি মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক রকমের কেঁপে উঠছিলো।

কি হঁইএ্যছে বটে?

ক্যায়া মালুম!

ডুলি ওপরে উঠছে। সাত নম্বর ডিপের দশ নম্বর লেভেল থেকে ওরা এখন একশো ফুটেরও বেশি উঠে এসেছে। মাঝখানে প্রায় থেমে গিয়েছিলো ডুলি। এখন চলছে। ছ'জনেরই কপালে দুশ্চিন্তা জমছে। ওরা অভিজ্ঞতা থেকেই এটা জানে, হেডগিয়ারে কোন বড় ধরনের যান্ত্রিক গোলোযোগ ছাড়া 'কেজ' অর্থাৎ ডুলির চলাচল এমন হতে পারে না।

আবারও একটা ঝাঁকুনি। এবারকার ঝাঁকুনি বেশ জোরে। চিন্তিত মজুররা সবাই। নারান মাঝেমাঝেই যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। তার ওপর ডুলির এই ঝাঁকুনির চোটে সে আরো বেশি ছটফট করছিলো। মাঝে মাঝে পেটের ব্যথার চোটে বাপ-রে! মা-রে! —বলে চিৎকার করে উঠছিলো।

নারানের ছয় সঙ্গী চিন্তাকুল। তাঁর যন্ত্রণাকর ছটফটানি ওদের মনকে নাড়া দিচ্ছে অনবরত।

হাঁ ভাগোয়ান। হামলোগ ক্যায়া কঁরু!

পহেলে উপ্‌পর তো চলো!

ওরা তো জানে, কয়লা খাদান কখনো কখনো ওদেব জীবনে মৃত্যু গহ্বর হয়ে ওঠে। কত শ্রমিকের রক্ত কয়লার কালো রঙের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, কে তার হিসেব রাখে? বরং মৃত শ্রমিকের হিসেব যাতে না থাকে, কর্তৃপক্ষ সেই চেষ্টাই করে। তাই খনি মজদুরদের নিজেদের হিসেব নিজেদেরই রাখতে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের ঘটনা ঘটেই গেল। ওপরে পিট টপে, হঠাৎ মাঝপথে দারুণ ঝটকা দিয়ে থেমে গেল হেডগিয়ারের চাকা। মাঝখানে, অর্থাৎ, পিট বটমে আটকে গেল ডুলি। ওপরে উঠছে থাকা দিবসদের ডুলি মাটি থেকে আড়াইশো ফুট নিচে ঝুলে রইলো। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো খাদানের ওপর। আর নিকষ কালো অন্ধকার সুড়ঙ্গে অসহায় মানুষগুলোর মধ্যে আতঙ্কের সঙ্গে একটু একটু করে ছড়াতে লাগলো ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয়। ওদের ক্যাপল্যাম্পের আলোগুলো সংকীর্ণ খাড়া সুড়ঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগলো।

দুই

ওপরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। থেকে গেছে হেডগিয়ার। খনির নিচে আটকে গেছে কয়েকশো মজদুর। মাঝখানে আড়াইশো ফুট নিচে ডুলিতে অসুস্থ নারান মাণ্ডিকে নিয়ে আটকে পড়েছে ছ'জন শ্রমিক। এই খবর নিমেষে চাউড় হয়ে গেল। ধাওড়া আর কোয়ার্টারগুলো থেকে মজদুরদের বউ-বাচ্চা, বাবা-মায়েরা ছুটে আসতে লাগলো। চিৎকার-চেঁচামেচি, হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। কান্নাকাটি করচে মেয়ে-বৌরা।

এই অস্থিরতা বারেবারে ধাক্কা মারছিলো মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার নৌশাদ আলির মস্তিষ্কে। তিনি কি করবেন ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। তখনই তাঁর কানে ভেসে এলো এক বৃদ্ধা মহিলার বুকফাটা আর্তরব।

হাঁই মেরে মতিয়া রে! তু কাঁহা গৈল রে-এ-এ-এ-এ!

মহিলার কান্না শুনে নৌশাদ আলি ট্যান্ডেল জমাদার সুন্দর ভগতকে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কাঁদছেন কেন এভাবে? মতিয়া কে?

মতিয়া সিং উয়ার ছোট্র ছিল্যা বটে। গত্য বছরে এক্সিডেন্টে মইরল। উঁয়ার বড় ছিল্যা এখ্যন ই খাদানে আঁটকাঞি গেঁছ্যে বটে।

বড় ছেলের নাম কি?

বুধন সিং। বুধিয়া।

আরো অনেক মহিলা ও বাচ্চাদের কান্না, পুরুষদের হা-হুতাশ শোনা যাচ্ছিলো। এসবের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো নৌশাদ আলির মনের মধ্যে। তিনি দু-হাতে মাথা চেপে ধরে তাঁর চেয়ারে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। বাইরে চিৎকার-চেঁচামেচি চলছিলো। অফিস ঘরে কারোর মুখে কোন কথা ছিলো না। সবাই নিশ্চুপ।

বাইরে চিৎকার-হাহাকার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

উঠে পড়লেন নৌশাদ সাহেব। ট্যান্ডেল জমাদারকে ডাকলেন, সুন্দর!

সুন্দর ভগত ছুটে এলো। —কি বলছেন স্যার?

টেম্পোরারি ক্রেনটা পিট মাউথের কাছে আনতে বলো। আমি নিচে নামবো।

আপনি লাঁববেন?

হ্যাঁ। কোথায় কি ফল্ট করেছে, দেখি।

ট্যান্ডেল জমাদারের কাজ হলো খনির নিচে ভারী মালপত্র বওয়া। যন্ত্রপাতি বা কাজের জিনিস পিট বটমের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সুন্দর ভগত ট্যান্ডেল জমাদারের কাজ করে। সুন্দর বললো, স্যার, আপনি লাঁববেন কেনে? দু'টা মিস্তিরি দ্যান। আম্যি লাঁবছি।

না না। আমিই নামবো। একজন মিস্তিরি নাও। তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

পিটের অস্থায়ী ক্রেনে লাগানো টবে চেপে ঝুলতে ঝুলতে পিটের আটকে পড়া জায়গায় নামলেন নৌশাদ আলি। সঙ্গে সুন্দর ভগত আর মিস্ত্রী রামজীবন সর্দার।

ক্যাপল্যাম্প ছাড়াও নৌশাদ আলির হাতে ছিলো শক্তিশালী টর্চ। তিনি টর্চের আলো ফেলে ডুলির রোপ নজর করে দেখছিলেন। মিস্ত্রিকেও বললেন, রামজীবন, খুব ভালো করে দেখো, গণ্ডগোলটা কোথায়?

স্যার, ওই গাইড ব্র্যাকেটটা দেখুন!

আলি সাহেব টর্চের আলো ফেললেন সেদিকে।

তাই তো। ডুলির একটা গাইড ব্র্যাকেট আটকে গেছে গাইড রোপের সঙ্গে।

এদিকে পিটের কয়লার দেওয়াল থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। সেই জলে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে নারান মান্ডির সঙ্গে থাকা ছ'জন শ্রমিক। যার মধ্যে দিবস রুইদাসও রয়েছে।

নৌশাদ আলি ওদের আশ্বস্ত করে বললেন, প্রবলেমটা লোকেট করা গেছে। বুধিয়া, দিবস! তোমরা একটু কষ্ট করো। কেজটা এক্ষুনি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি।

খনির সেকেণ্ড আউটলেট দিয়ে যথেষ্ট পরিমানেই বাইরের বাতাস ঢুকছিলো। তাই সুড়ঙ্গে অক্সিজেনের কোন অভাব ছিলো না। কিন্তু নারান মাণ্ডির অবস্থা আরো খারাপ। পেটের যন্ত্রণায় সে গোঙাতে গোঙাতে একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেছে। দিবস কিংবা বুধনরাও আতঙ্কে প্রায় ভেঙে পড়েছে। মাইং ইঞ্জিনিয়ার নৌশাদ আলির কথায় ওরা যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলো। দিবস অসুস্থ নারানকে একটু ভরসা দেবার চেষ্টা করলো।

হাঁই নারান! ঘাবড়াও মাৎ। ডুলি ঠিক হুঁই যেঁনছে। আভি আভি উঠেগা উপরমে।

কিন্তু নারানের কোন সাড় নেই। বুকটা ধক্ করে উঠলো দিবসের।

নারান! নারান! হেই নারান!

নারানের গোঙানি বন্ধ হয়ে গেছে। নড়াচড়াও করছে না।

হেই নারান! ক্যায়া হুয়া? আচ্ছা নেহি লাগতা কেয়া?

ওরা ভয় পেয়ে গেছে! নারানের কোন শব্দ নেই।

ডুলিতে গুঞ্জন শুনে নৌশাদ আলি পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো?

নারানকো কোই আওয়াজ না মিলি।

নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখো, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না।

হাঁ হাঁ। ওহি ঠিক হ্যায়।

তাহলে দেওয়ালের ঝরে পড়া জল হাতে নিয়ে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দাও। পেটেও জল দাও!

অক্সিজেনের যোগান ঠিক থাকলেও এই অপরিসর খাড়া গহ্বরে এতক্ষণ

অনিশ্চয়তা মধ্যে ঝুলে থেকে ওঁরা হাঁপিয়ে উঠছিলো। ওদের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। ওরা আর পারছিলো না। আকুল করা হতাশা তখন ওদের কণ্ঠস্বরে।

হাঁ ভাগোয়ান ! হা আল্লা! কেয়া করু!

তিন

নৌশাদ সাহেব মিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দেওয়াল থেকে ঝরে পড়া জলে তিনিও একেবারে ভিজে গেছেন। তবুও এই ভয়ানক বিপদের মুখে তাঁকেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন, রামজীবন, তুমি টবের মধ্যে থাকো। আমি আর সুন্দর বাইরে থেকে কাজগুলো সেরে ফেলি।

এবার আলি সাহেব আর সুন্দর ভগত টবের বাইরের দিকে এসে ঝুলতে লাগলো। তারা নিজেদের শরীরে সেফটি বেল্ট বেঁধে ফেললো। দেওয়ালে সেফটি হোল-এর সামনের হুকে সেই সেফটি বেল্টের দড়ির ফাঁস লাগিয়ে দিলো। এভাবে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নিলো দু'জনেই।

রোপের সঙ্গে ডুলির লাগানো ক্ল্যাম্পটিকে ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে কাটতে শুরু করলেন নৌশাদ আলি। এক সময় ক্ল্যাম্পটা খুলে গেল। এখন গাইড রোপের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রইলো ডুলিটি।

প্রথম পর্বের কাজ শেষ। অসুস্থ রোগীকে নিয়ে জলে ভেজা ছয়টি শ্রমিককে তিনি হাসতে হাসতে খুশির খবর দিলেন।

তোমরা এক্ষুনি ওপরে উঠতে পারবে। কোন চিন্তা নেই।

তারা এবার পিটের দেওয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করে ডুলির সঙ্গে যুক্ত করবে। এরপরই তিনটি গাইড রোপের ওপর ভরসা করে ডুলিকে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা করতে পিট টপে সঙ্কেত পাঠানো হবে। আলি বাইরে থেকেই বললেন, রামজীবন, ডুলিতেই থাকো।

ঠিক আছে স্যার।

সুন্দর, ডুলিটা শক্ত করে ধরে থেকো। দেওয়ালের হুক থেকে সেফটি বেল্ট খুলে ডুলির চেনের সঙ্গে বেঁধে না দেওয়া পর্যন্ত হাত আলগা কোরো না। আমি না বলা পর্যন্ত সাবধান থাকবে।

হাঁ স্যার।

প্রথমে আলি পিটের দেওয়াল থেকে ট্যাণ্ডেল জমাদার সুন্দর ভগতের সেফটি বেল্টের হুক খুললেন। পরে সেটা ডুলির চেনের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। এবার ভগত ডুলির ছাদে।

এই মুহূর্তে ডুলির মধ্যে রয়েছে অসুস্থ নারান মাণ্ডি। দিবস-বুধিয়ারা ছ'জন,

আর মিস্ত্রী রামজীবন সর্দার। ডুলির ছাদে নিরাপদে সেফটি বেল্ট বাঁধা অবস্থায় আছে সুন্দর ভগত। নৌশাদ আলি ডুলির ছাদে সুবিধাজনক অবস্থায় বসে নিলেন। বললেন, সুন্দর, আমাকে ধরে থেকো। দেওয়াল থেকে আমি আমার সেফটি বেল্ট খুলছি। সামাল্‌কে।

কোল মাইন্স আইন অনুযায়ী ডুলি ওঠানামার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। প্রথম দু'বার ঘণ্টা বাজিয়ে 'রেডি' অর্থাৎ প্রস্তুত হবার সঙ্কেত জানানো হয়। পরে আর একবার ঘণ্টা বাজিয়ে ডুলিকে ওপরে তোলার জন্য ইঞ্জিন চালু করতে বলা হয়।

সব কিছু ঠিকঠাক আছে। ডুলির ছাদে নিজের শরীরের ভর রেখে নৌশাদ আলি নিজের সেফটি বেল্ট দেওয়ালের হুক থেকে খুলে ফেলেছেন। এবার তিনি সেফটি বেল্টটা ডুলির চেনের সঙ্গে বাঁধবেন।

ডুলি ওপরে ওঠার জন্য তৈরি। কিন্তু হঠাৎ অঘটন।

দিবসরা ওপরে ওঠার সময় প্রথমবার যেভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছিলো ডুলি, এখনও তাই হলো। এইসব যান্ত্রিক গোলোযোগে ওপরে পৌঁছলো ভুল সঙ্কেত। ডুলি ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে হঠাৎ করেই।

আচমকা এই ঘটনায় সমস্ত কিছু ওলোটপালট হয়ে গেল। অন্ধকার অপরিসর সুড়ঙ্গে দীর্ঘক্ষণ থেকে সবাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। ডুলির ভেতরকার মানুষগুলো ওপরে ওঠার আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। চিৎকার করে ওরা নিজেদের উল্লাস প্রকাশ করলো। সেই হর্ষধ্বনি খনি সুড়ঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে অজস্র প্রতিধ্বনির জন্ম দিলো। ওরা এখনই উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো দেখবে।

শুধু এই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি ডুবিয়ে দিলো আর একটি আর্তস্বর।

দেওয়ালের হুক থেকে নিজের সেফটি বেল্ট খুলে ফেলেছিলেন তখন নৌশাদ আলি। ঠিক সেই সময় আচমকা ঝাঁকুনি। তার পরেই চলতে শুরু করে ডুলি। তখনই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলো ট্যান্ডেল জমাদার ভগত। দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে নৌশাদ আলিকে জাপটে ধরে। আলি সাহেব তখনও তাঁর সেফটি বেল্ট ডুলির সঙ্গে লাগাননি। ভগত ওবারে তাঁকে জড়িয়ে ধরায় তিনি কিছু করতেও পারছিলেন না। এই অবস্থায় তাঁর ডান হাতের সেফটি হুকের দড়ি পিটের দেওয়ালের হুকে আটকে গেল।

ডুলি ওপরে উঠছে। নিমেষের মধ্য ঘটল অঘটন। ডুলির ওপরে ওঠার টানে নৌশাদ আলির ডান হাত কনুই থেকে ছিঁড়ে রয়ে গেল দেওয়ালের হুকে।

আর্ত চিৎকার করে ছটফট করতে লাগলেন আলি সাহেব। তাঁর আর্ত চিৎকারের শব্দ ডুলির ভেতরের মানুষগুলোর হর্ষধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে সুড়ঙ্গে অজস্র প্রতিধ্বনিব জন্ম দিলো। দিবস, বুধন, রামজীবনরা ভেতরে থেকে তা জানতে পারলো না।

দেখলো শুধু সুন্দর ভগত। বুঝলো কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। সে মুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন আলি সাহেব। ডান হাতের ছেঁড়া কনুই থেকে গলগল করে রক্ত পড়ে ডুলির ছাদ মাখামাখি হয়ে গেল। এক্ষুনি পিছলে পড়ে সুড়ঙ্গের অতলে তলিয়ে যাবেন তিনি। সুন্দর ভগত তাঁর শরীরে নিয়ে এলো যেন সিংহের শক্তি। যন্ত্রণাদীর্ণ আলি সাহেবের দাপিয়ে ওঠা শরীরটাকে বজ্র আঁটুনিতে ধরে রাখলো সে।

ডুলি ওপরে উঠে এসেছে। ওরা নিচে নেমেছিলো দুপুরে। এখন সন্ধে।

বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ঝলসে যাচ্ছিল পিট টপের সর্বত্র। হাজার পুরুষ নারী দাঁড়িয়ে সেখানে।

রক্তাক্ত আমি সাহেবকে দেখে ওরা হতভম্ব। ছুটে এলেন খনির ডাক্তার। আলি সাহেব তখন জ্ঞান হারিয়েছেন। তিনটে অ্যাম্বুলেন্স মজুতই ছিলো। একটায় নারান মাণ্ডি আব উদ্ধারকারী ছ'জন শ্রমিককে তোলা হলো। অচেতন আলি সাহবের ছিন্ন হাতে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে স্ট্রেচারে করে দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানো হলো। তাতে উঠলেন ডাক্তার, আর উঠলো সুন্দর ভগত।

দুই অ্যাম্বুলেন্সই ছুটলো আসানসোলে। ওখানেই রয়েছে কাল্লা হাসপাতাল। ইস্টার্ণ কোলফিল্ড লিমিটেডের রাণীগঞ্জ কোলিয়ারি বেল্টের সেটাই সেন্ট্রাল হসপিটাল।

বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। কেউ আজ মারাও যায়নি। তবু এই অযাচিত ঘটনায় উপস্থিত জনতা নির্বাক হয়ে গেছে।

সহকর্মীদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে খনিগর্ভে নেমেছিলো দিবস রুইদাস, সুন্দর ভগত, রামজীবন সর্দার আর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার নৌশাদ আলি। ওঁরা কেউই বিপদকে তোয়াক্কা করেনি। ফিরেছে সবাই। কিন্তু নৌশাদ আলির যে মমতাময় হাত দু'টি তাঁদের বিপদের দিনে বরাভয় হয়ে সামনে হাজির হতো, তার একটি আর নেই।

কোলিয়ারি শ্রমিক, নারী-পুরুষ সবার চোখেই জল। যন্ত্রণাময় মন নিয়ে ক্লান্ত শরীরে ওরা একে একে ঘরে ফিরে যায়। মালভূমিতে রাত বেড়ে চলে।

চার

পরদিন সকালে শ্রমিকদের অনেকেই গেছে হাসপাতালে। নারান মাণ্ডি আজ বাড়ি ফিরবে। দিবসদের রাতেই প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হয়েছে। ওরা সবাই ক্লান্ত। রাতেই নৌশাদ আলির হাতে অপারেশন হয়েছে।

সকালে জ্ঞান ফিরেছে আলি সাহেবের।

তাঁর বেডের চারধারে দাঁড়িয়ে ওরা সবাই। বুধন সিং আর তার মা, দিবস রুইদাস, রামজীবন সর্দার, বিটটু রামচন্দ্রন, বনারস পাণ্ডে, নারান মাণ্ডির বউ সাগর, সুন্দর ভগত, সরিফুল এমন আরো অনেকে।

স্যার, হামলোগোকে লিয়ে অ্যায়সা হো গিয়া আপকো।

বনারস পাণ্ডের এই কথায় ক্লান্ত হাসি হাসলেন নৌশাদ আলি। ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতের দিকে তাকালেন। বললেন, সব ঠিক আছে। তোমরা ভেবো না। এখনো তো বাঁ হাতটা আছে রে বাপু।

এ-কথায় ওরা অনেকেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। ওরা বুঝতে পারছিলো, বড়া হিম্মতওয়ালা আদমি আলি সাহাব। সিনা মে উনকো যাদা তাকদ!

ওঁদের চোখে জল। আলি সাহেব দেখলেন, সরল, সাদাসিধে মানুষগুলো তাঁকে কেমন আগলে ঘিরে রেখেছে। বললেন, ভাবছো কেন? বাঁ হাতেই কাজ করবো। আর তোমরা রইলে তো! তোমরাই আমার ডান হাত।

আলি সাহেবের মুখে স্মিত হাসি। ওরা দেখছিলো, ওরা অনুভব করছিলো, সেই হাসি কেমন দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

দোয়া

তখন সন্ধে সাড়ে ছ'টা। অরূপ ওদের পাড়ার রাস্তার মোড় জীবন দাসের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ছিলো। সবেমাত্র সে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছে, তখনই পেছন থেকে ওর দাদার বড় ছেলে দিবার গলা শুনতে পেলো।

কাকু, কাকু!

কি হলো?

বাড়িতে ফোন এসেছে।

তো কি হয়েছে?

এমারজেন্সি। তোমাকে ডাকছে দাদু। চলো এক্ষুনি।

জীবনদাকে চা বানাতে বারণ করে সে ছুটলো বাড়ির দিকে। পেছনে পেছন দিব্য।

অরূপ বাড়িতে ঢুকেই দেখলো, পরিবেশ থমথমে। বাবার ঘরে ঢুকে দেখলো, মা-বাবা বসে আছেন। বাবা চিন্তিত। মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন।

কি হলো?

এইমাত্র বুলবুলিতলা থেকে টেলিফোন করেছিলো সৌম্যজিৎ। সোনামনির অবস্থা খুব খারাপ। ওরা বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন? কি হয়েছে সোনামনির?

কি হয়েছে, তা লোকাল ডাক্তাররা ধরতেই পারছে না। খুবই নাকি খারাপ অবস্থা। তুই এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে এমারজেন্সিতে গিয়ে

খোঁজ করবি।

সোনামনি হচ্ছে অরূপের দিদি ভাস্বতীর একমাত্র মেয়ে। আট বছর বয়েস। ভাস্বতীর বিয়ে হয়েছে বুলবুলিতলায়। বর্ধমান-কালনা রোডে বুলবুলিতলা হচ্ছে বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম। প্রচুর সম্পন্ন কৃষকের বাস ওখানে। বিরাট গঞ্জ। আড়ৎ আর কোল্ড স্টোরেজের ছড়াছড়ি। ভাস্বতীর শ্বশুরবাড়ি কৃষক পরিবার হলেও এই প্রজন্মের অনেকেই চাকুরিজীবী। একজন ডাক্তার। পরিবারের একটিমাত্র মেয়ে সোনামনি খুবই আদরের।

সোনামনির এমন কি হলো, যে মরণ বাঁচন অবস্থা!

বাবা বললেন, অরূপ, সঙ্গে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে যা। হাসপাতালে ওদের সঙ্গে দেখা করেই আমাকে একটা টেলিফোন করিস।

দুশ্চিন্তা বড্ড ছোঁয়াচে ব্যাপার। মা-বাবার থেকে সেই দুশ্চিন্তার প্রগাঢ় ছায়া অরূপের মনকেও ছেয়ে ফেললো। অরূপ সবে বি কম পাশ করেছে। ও ওরই বাল্যবন্ধু-সহপাঠী রণেশের বাড়িতে ছুটে গেল। তখন বাজে সন্ধে সাতটা কুড়ির মতো। রণেশ বাড়িতেই ছিলো।

বুঝলি রণেশ, ভাস্বতীর মেয়েটার নাকি বাড়াবাড়ি অবস্থা। এক্ষুনি বর্ধমান যেতে হবে। তোর কোনো জরুরী কাজকর্ম আছে কি?

কেন? তোর সঙ্গে যেতে হবে, এই তো! তুই বাড়িতে গিয়ে রেডি হয়ে নে। আমি আসছি।

আসলে অরূপদের পাঁচ-ছ'জনের একটা দলই আছে, যে কোনো সমস্যায় যারা সবসময়েই ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য সদাই তৈরি। কেউ মারা গেলে শ্মশানে, কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে, কিংবা পাড়ায় চোর-ডাকাত পড়লে রাত বিরেতে লাঠি হাতে পাহারা দেওয়া ইত্যাদি কাজ। সবেতেই ওরা একপায়ে খাড়া। তাই রণেশকে ব্যাপারটা খোলসা করে বলার আগেই সে ব্যাপারটা ধরে ফেললো।

রণেশের কাঁধে ঝোলাব্যাগ। অরূপের হাতে একটা অ্যাটাচি। ওরা হাওড়া স্টেশনে সুবারবন রেলের কাউন্টার থেকে যখন বর্ধমান স্টেশনের টিকিট কাটলো, তখন রাত সোয়া আটটা বাজে। স্টেশনের মাইক্রোফোনে তক্ষুনি ঘোষণা হলো, মেন লাইনের আপ বর্ধমান লোকাল আটটা আঠাশ মিনিটে পাঁচ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। ওরা দৌড় লাগালো।

ট্রেনটা ওরা ভালোভাবেই পেয়ে গেলো। মোটামুটি ভিড় ছিলো ট্রেনে। ডেলি প্যাসেঞ্জারও নেহাৎ কম নেই।

পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায় ট্রেন ব্যান্ডেল স্টেশনে ঢুকলো। ব্যান্ডেল থেকে ট্রেন বেশ ফাঁকা। মগরা আর পাভুয়া স্টেশনে প্রচুর যাত্রী নেমে গেল। ট্রেন যখন

মেমারি ছাড়লো ওদের কামরায় তখন সাকুল্যে ছ'জন লোক বসে আছে। অরূপ ভাবছিলো, অ্যাটাচিতে পাঁচহাজার টাকা রয়েছে। ডাকাত বা ছিনতাইকারী উঠলেই হয়েছে। স্বাভাবিক থাকার জন্য ও আর রণেশ কথাবার্তা বলছিলো একটু উচ্চস্বরেই।

একেবারে আচমকা ব্যাপার। বুঝলি রণেশ। টেলিফোন পেলাম আর ছুটলাম। তোকেও ঝামেলায় ফেললাম।

আমি কোনো ঝামেলায় পড়িনি। বাচ্চা মেয়েটা ভালো থাকলেই ভালো।

অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি! তাই না। ওখানে গিয়ে কি অবস্থা দেখবো, কে জানে!

আমার তো মনে হয়, নেগেটিভ চিন্তা করার কোনো মানেই হয় না।

শক্তিগড় স্টেশনে গাড়ি থামলো। তিন জন নেমে গেল। রইলো বাকি তিন। অরূপ আর রণেশকে বাদ দিলে অচেনা শুধু একজন। পুরো কামরা কেমন একটা নৈঃশব্দ্যে খাঁ-খাঁ করছিলো। শুধু লাইনের জোড়ে জোড়ে ট্রেনের চাকার খটাখট শব্দ যেন ওদের কানে আরো বেশি করে বাজতে লাগলো।

হঠাৎ কড়-কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়লো। বাইরে অন্ধকার যেন প্রবল হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে গঞ্জ হাট মাঠ ঘাট আর গাছপালা ঘেরা গ্রামগুলোর ওপর। ওরা দু'জন ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। ফের মাঝ আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকালো। সেই তীব্র বিদ্যুচ্ছটা মুহূর্তের জন্য বাইরের চরাচরকে আলোয় ভাসিয়ে দিলো।

তৃতীয়জনও জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলো।

বাবাঃ! এত মেঘ করেছে, ট্রেনে বসে একদম বুঝতে পারিনি!—কথাটা বললো রণেশ।

হ্যাঁ, ট্রেন বর্ধমান ঢোকার আগেই তো দেখছি বৃষ্টি নেমে যাবে।

এবং তাই-ই হলো। দিকবিদিক কাঁপিয়ে ঘন ঘন বজ্রগর্জন তুলে প্রবলবেগে নামলো বৃষ্টি। গাড়ি যখন বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়ালো, তখন ভেসে যাচ্ছে প্লাটফর্ম। ভেপার ল্যাম্প আর ফ্লুরোসেন্ট টিউবলাইটের আলোর চারধারে প্রবল বৃষ্টি থেকে চূর্ণ হওয়া জলকণাগুলো গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের ধাক্কা হিমেল বাতাস টেনে এনে আছড়ে ফেলছে প্লাটফর্মের বুকে।

কিচ্ছু করার নেই। অরূপ আর রণেশ মিনিট দশেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। অস্থিরতায় ছটফট করছিলো অরূপ। তুলনায় রণেশ অনেকটাই ধীরস্থির। সবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মুষলধারার এই বৃষ্টি এক্ষুনি কমবেও না। অনেক ভেবে ওরা শেডের নিচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওভারব্রিজের মুখে চলে এলো। অরূপের মা ওর অ্যাটাচিতে একটা ছাতা দিয়েছিলেন। অরূপ ছাতাটা বের করলো! রণেশ অরূপের অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারছিলো।

বৃষ্টিটা সামান্য ধরলেই বেরিয়ে পড়বো, বুঝলি অরূপ।—বললো রণেশ।

কুড়ি বাইশ মিনিট পরে বৃষ্টির দাপট অনেকটা কমলো। একটা ছাতার নিচে দু'জনেই ছুটলো রিকশা স্ট্যান্ডে। সামনে যে রিকশাটা পেলো, সেটাতেই উঠে পড়লো।

চলো মেডিক্যাল কলেজ!

বাবু, এই বৃষ্টিতে পঁচিশ টাকা লাগবে। ফিরতি খালি আসতে হবে।

ঠিক আছে। চলো ভাই।

কিন্তু হাসপাতালের এমারজেন্সিতে এসে ওরা ভাস্বতী, সোনামনি, কিংবা সোনামনির বাবা সৌম্যজিৎ কোনার, কাউকেই পেলো না। শিশু ওয়ার্ডে ছুটে গেল ওরা। না, সোনামনি কোনার বলে কোনো বাচ্চা মেয়ে আজ সন্ধের পরে এখানে ভর্তি হয়নি। রণেশ বললো, চল্, এমারজেন্সিতে ভালো করে খুঁজে নিই।

ফের ওরা এমারজেন্সিতে এলো। শিফ্ট বদলে এমারজেন্সিতে এখন অন্য সিস্টার এসেছে। ওদেরকে এ-রকম পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে দেখে ফোর্থ ক্লাস স্টাফ এক হিন্দিভাষী মহিলা এগিয়ে এলো।

কেয়া হুয়া বাবুসাব?

আটটা ন'টা নাগাদ একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কেউ এসেছিলো? দেখেছো?

হাঁ হাঁ। আয়া থা।

কোন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে বলতে পারো?

উস্‌কো এডমিশন নেহি হুয়া বাবু।

কেন?

হাম থা উসি টাইম।—খানিক থেমে সেই মহিলা একটু যেন দম নিয়ে নিলো।

উস্‌কা মা-বাবা আয়া থা। পড়োশি ভি আয়া থা। উ লোগ ফিন ঘর চলা গিয়া। উও লেড়কি কি লাস্ট ইস্টেজ হো গিয়া। আয়সা হি তো ডগদরবাবুনে বোলা।

তুমি ঠিক ঠিক দেখেছো তো?—অরূপের গলা শুকিয়ে কাঠ। অতি কষ্টে সে এই প্রশ্নটুকুই করলো।

হাঁ হাঁ। ওহি টাইম হাম হিঁয়া পর ডিউটি মে থা।

ওরা ছুটে হাসপাতালের বাইরে এলো। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছিলো। রণেশ একটা এস টি ডি বুথে ঢুকে কলকাতায় অরূপদের বাড়িতে টেলিফোন করলো।

মেশোমশাই, আমি রণেশ বলছি। হাসপাতালে এসে সৌম্যজিৎদের আমরা পাইনি। মা শুনলাম, ওরা বাড়ি চলে গেছে। তবে কোনো চিন্তা করবেন না। কোনো গাড়ি টাড়ি পেলে আমরা বুলবুলিতলা চলে যাব। না হলে রাতটুকু হোটেলে থেকে ভোরে যাবো। এর বেশি কিছু বললো না রণেশ।

সেখান থেকে আর একটা রিকশা ধরে ওরা বাসস্ট্যান্ডে এলো। তখন বাজে সাড়ে এগারোটা। এই সময় কোনো বাস ছাড়বার প্রশ্নই নেই। কাছেই একটা ধাবার মতো হোটেল দেখতে পেয়ে ওরা সেখানে গেল।

রণেশ বললো, বুঝলি অরূপ, ধাবাতে ড্রাইভার হেল্পার কন্ডাকটররা তো খাওয়া দাওয়া করে। ওদের কাছ থেকে কোনো জিপ বা অ্যাম্বাসাডরের ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি।

ধাবার কাউন্টারে গিয়ে অরূপ আর রণেশ বললো ব্যাপারটা।

যারা ওখানে খাচ্ছিলো, ধাবার মালিক তাদের বিষয়টা বললো।

একটা জিপ বা প্রাইভেট কার পাওয়া যাবে নাকি?

কোথায় যাবেন?

বর্ধমান-কালনা রোডে বুলবুলিতলায়।

কিন্তু এত রাতে কেউই ওই রাস্তায় অতদূর যেতে ইচ্ছুক নয়। তাও এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। সবাই চুপ করে গেল।

একটু মুষড়েই পড়লো অরূপ। যারা ধাবায় খাওয়া দাওয়া করছিলো, তারা যে এই সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকশ্রেণীর নয়, তা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। রণেশ ভাবছিলো, এখন কি করব?

অরূপ, বিকেল থেকে তো খাওয়াদাওয়া হয়নি। এখানে একটু খেয়ে নিবি?

খেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। সোনামনির কথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে উঠছে। কি যে হলো ওর কে জানে! এক কাজ কর রণেশ। তুই খেয়ে নে। তারপর হাসপাতালের দিকে যাই।

কাউন্টারের মুখোমুখি খাচ্ছিলো কালোমতো একটা লোক। লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

আপনারা কোথায় যাবেন?

বুলবুলিতলা।

ঠিক আছে। আমার ট্রেকারে যেতে পারেন। ছ'শো টাকা লাগবে।

রণেশ দেখছিলো লোকটাকে। মুখে কালো ছোপ ছোপ দাগ। বাঁ চোখের পাতাটা বন্ধ। লোকটা কেমন কে জানে! ভাবছিলো রণেশ। ধাবার মালিক বললো, কাশীদা, তুমি যাবে? যাও তা'হলে। একটা বাচ্চা মেয়ের অবস্থা খারাপ। এনাদের সেখানে পৌঁছোতেই হবে।

অরূপের তো আর তর সইছিলো না।

দুই

বর্ধমান স্টেশনের পাশ দিয়েই সড়কপথে একটা সেতু চলে গেছে রেললাইন টপকে। এই পথেই কালনা বর্ধমান রোড। ব্রিজ থেকে নেমে ট্রেকার ছুটলো। প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। দু'জনে শীতে কাঁপছিলো। স্টিয়ারিং হাতে ড্রাইভার নিশ্চুপ। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ মেঘভারে ভারাক্রান্ত। যে কোনো সময়ে ঢল নামতে পারে। ঘন অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেকারের হেডলাইটের আলো বৃষ্টিস্নাত পিচসড়ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। কি-ই বা বলবে! অরূপের মন জুড়ে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। যা রণেশের মনেও ছড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার চুপ। মাঝেমাঝেই তার চোয়ালে কাঠিন্য দেখা দিচ্ছে। রণেশ খেয়াল করেছিলো, ধাবার মালিক লোকটাকে কাশীদা বলছিলো। কিছু একটা কথা বলা দরকার। এই দারুণ দুর্যোগে, যখন দুঃসংবাদই শুনতে হচ্ছে শুধু, তখন একটা মানুষ আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যগ্র হতেই পারে। তাই রণেশই কথা শুরু করলো।

কাশীদা, আপনার বাড়ি কোথায়?

অণ্ডাল।

আপনার ট্রেকার কোন রুটে চলে?

বর্ধমান-রায়না রুটে।

রোজ অণ্ডাল যান না বোধ হয়?

না।

একটাও বাড়তি কথা বলছে না ট্রেকারের ড্রাইভার। রণেশ যা জিজ্ঞেস করছে, সে শুধু তার উত্তর দিচ্ছে।

মাঝেমাঝেই আকাশে বিদ্যুৎ-এর ঝলক। তার পরই গুড়গুড় শব্দে বাজ পড়ছে। ঝির ঝির বৃষ্টি এখন বড় ফোঁটায় প্রবল আকার নিলো। ওরা হাটগোবিন্দপুর পেরলো। পেরলো বাঁকা নদীর সেতু। এই মুহূর্তে প্রবল বর্ষণ চলছে। মাঝে মাঝে গাঢ় অন্ধকারকে মুহূর্তের জন্য দূর করে দিচ্ছে আকাশ ফালা ফালা করে দেওয়া বিদ্যুতের চমক।

তারই মধ্যে ট্রেকার চলছে। ওরা এবার বিরাট গঞ্জ এলাকা সাতগেছিয়া পেরলো। এই দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগও অরূপকে ছুঁতে পারছে না। ও ভাবছিলো, সোনামনিব কি হলো কে জানে। ট্রেকার চলেছে নিজস্ব গতিতে। গঞ্জ এলাকা পেরোলেই দু'পাশে ধানক্ষেত। চলে এলো বোহার। তারপর বোহার হাটতলা। এতক্ষণ বাদে মানুষটা কথা বললো।

বুলবুলিতলা এসে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ঠিক আছে।

স্তব্ধ চরাচর। প্রবলতর বৃষ্টি। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা। অস্থিরতা। কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। রণেশ এরই মধ্যে বারবার শুধু ড্রাইভার কাশীদাকে লক্ষ্য করছিলো। রণেশের শুধুই মনে হচ্ছে, মানুষটা কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। মাঝে মাঝে নিজের মনেই অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে সে। তখনই তার চোয়াল কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মুখে কালো ছোপ ছোপ দাগ। বাঁ চোখের পাতাটা সর্বক্ষণের জন্য বন্ধ। একটা চোখ যেন সবসময়ই জ্বলছে।

গাড়ি একটা বড়সড় বাঁক নিলো। টাল সামলাতে না পেরে অরূপ রণেশের ঘাড়ে এসে পড়লো। তারপরই গাড়ির গতি যেন একলাফে বেড়ে গেল।

কি হলো কাশীদা?

কিছু না।

আর একটা বড় বাঁক। দু'জনে সেটা আঁচ করেই ট্রেকারের মাথার রডটা ধরে নিলো। কাশীদা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। নিপুণ হাতে সেই গতির মুখেই বাঁক নিলো কাশীদা। এবার সোজা রাস্তা। ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও দূরে বিদ্যুতের আলো দেখা যাচ্ছিলো। খানিকটা পথ প্রচণ্ড গতি তুলে আচমকাই ব্রেক কষে ট্রেকার দাঁড় করালো ড্রাইভার।

এটাই বুলবুলিতলা।

এসে গেছি তা হলে!—অরূপ লাফ দিয়ে নামলো। নামলো রণেশ। ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করেছে।

তুই এখানে কখনো এসেছিস?

চার পাঁচবার এসেছি। কালনা দিয়ে এসেছি। নেমে বাঁদিকে গিয়েছি। এদিক থেকে তা হলে ডাইনে হবে। মনে হচ্ছে, সামনের এই রাস্তাটাই। হ্যাঁ, এই তো, মিষ্টির দোকানটাও আছে।

ট্রেকারের সিট থেকে টাকা ভর্তি অ্যাটাচিটা হাতে নিলো অরূপ।

রণেশ বললো, কাশীদা, একটু দাঁড়াবে। বাড়িটা খুঁজে পেতে যদি অসুবিধা হয়।

অরূপ বললো, না হলে এক কাজ করুন। গাড়িটা সাইড করে রেখে চলুন না আমাদের সঙ্গে। এতটা পথ এলেন। আপনি যেভাবে সাহায্য করলেন এই বিপদের দিনে।—অরূপের গলা ধরে এলো।

কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না ড্রাইভারের চোখে-মুখে। বরং তাঁর একটা চোখ যেন ধ্বক করে জ্বলে উঠলো।

এই মধ্যরাতে, দুর্যোগের মধ্যে, এমন একটা সময়ে, অচেনা এই মানুষটার এমন অস্বাভাবিক আচরণ রণেশকে সত্যিসত্যিই ভাবিয়ে তুলছিলো। কারণ সে গোড়া থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করছে।

ততক্ষণে কাশীদা ট্রেকার ফের স্টার্ট করে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকিয়ে পাশে রেখে নেমে পড়লো।

চলুন তাড়াতাড়ি! আমাকে তো আবার বর্ধমানে ফিরতে হবে!

এ-কথা বলে কাশীদা অরূপ আর রণেশের সঙ্গে হাঁটা শুরু করলো।

মিনিট তিন চারেক হেঁটেই ওরা সোনামনিদের বাড়ি পেয়ে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ। এদের তিনতলা বাড়ি। বাড়ির গেটে একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বলছিলো। অরূপ গেটের কড়া নাড়তে লাগলো।

সৌম্যজিৎ! ভাস্বতী! আমি অরূপ! কলকাতা থেকে এসেছি।

কে?— দোতলা থেকে প্রত্যুত্তর এলো।

আমি অরূপ!

দোতলার জানালা খুলে সৌম্যজিৎ আর ভাস্বতী নিচে দেখতে পেলো অরূপকে।

দেখো দেখো! এত রাতে ভাই এসেছে। যাও! নিচে গিয়ে দরজা খুলে দাও।

সৌম্যজিৎ তাড়াহুড়ো করে নিচে নামছিলো। সে একনজর ড্রাইভারকে দেখেছে। তাতেই তার ভ্রূকুঞ্চিত হচ্ছিলো।

সৌম্যজিৎ বাইরের গেট খুলে দিলো। অরূপ জিজ্ঞেস করলো, সোনামনি কেমন আছে?

ভালো। ঘুমোচ্ছে। হাসপাতালে তিনটে ইনজেকশন পুশ করেছে। তারপরই সারভাইভ করতে আরম্ভ করেছে।

এ-কথা শুনেই কাশীদা হঠাৎ বলে উঠলো, ইয়া আল্লা! খুদাতালা আমার দোয়া শুনেছে।

আশ্চর্য সকলেই। সৌম্যজিৎ বললো, কাশীদা, তুমি!

আরে কোনারবাবু! তোমার মেয়ের অবস্থাই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো?

হ্যাঁ। তুমি ওদের নিয়ে এলে?

দেখতেই পাচ্ছো।

সৌম্যজিৎ এবার পরিচয় করিয়ে দিলো।—এ হচ্ছে কাশেম আলি। আমাদের সবার কাশীদা। পান্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে আমি তখন টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগ দিয়েছি। কাশেম আলি ওখানে তখন হেড ডাম্পার অপারেটর। দারুণ ফূর্তিবাজ কাশীদা। একটা দুর্ঘটনায় কাশীদার বাঁ চোখটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ওঁর কাজ চলে যায়। ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে কাশীদা একটা ট্রেকার কিনে চালাচ্ছে এখন। এত রাতে, কি অদ্ভুত যোগাযোগ! কেমন আছে তোমার মেয়ে আমিনা?

ভালো। বিয়ে হয়েছে। গত সপ্তাহে তার মেয়ে হয়েছে। এখনো বর্ধমান হাসপাতালে আছে। তোমার মেয়ের জন্য এই বাবু-র তো চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো। তোমার মেয়ে, তা তো আমি জানি না! এর কথা শুনে আমিনার

মেয়ের কথা মনে হচ্ছিলো। তাই ওদের পৌঁছে দিলাম।

ও কাশীদা, তোমাকে কি বলে যে—

কিছু বলতে হবে না। সারা রাস্তা খোদাতালার কাছে দোয়া মেঙেছি। আল্লা, মেয়েটাকে ভালো করে দিয়ো। ব্যস! আর কি চাই? আমি এবার ফিরবো। পরে আসবো। তোমার মেয়েকে দেখে যাবো।

কাশেম আলির পেছন পেছন সৌম্যজিৎ, অরূপ আর রণেশ বড় রাস্তা অবধি গেলো। অরূপ অ্যাটাচি খুলে টাকা গুনছিলো কাশীদাকে দেবার জন্য। হাত দিয়ে আটকালো কাশীদা।

টাকা আমি নিতে পারবো না। খুদাতালা আমার দোয়া শুনেছে। আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি।

কাশেম আলির কথায় এতটাই জোর ছিল যে, আর টাকা দেবার জন্য হাত উঠলো না অরূপের।

কাশেম আলি ট্রেকারে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো। হাত নেড়ে বললো, চলি কোনারবাবু! চলি ভাই! পরে দেখা হবে।

ট্রেকার বর্ধমানের পথ ধরলো।

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো ওরা তিনজন। হঠাৎ বৃষ্টিনামলো প্রবল। কিন্তু ওরা নড়লো না। ওরা হাঁটতে ভুলে গেছে। ওরা ভিজতে লাগলো। যতক্ষণ ট্রেকারের পেছনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছিলো, ততক্ষণ ওরা দাঁড়িয়েই রইলো।

নিয়তি ছিল অন্ধকারে

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। রেল লাইনের দু'পাশে চড়াই-উতরাই মালভূমির দিগন্ত বিস্তারি জমিতে আরো অন্ধকার গড়িয়ে এসে পাথুরে খাঁজে আটকে যাচ্ছে। এখানে-সেখানে প্রাণের স্পন্দনও আছে। আছে ঘরে ফিরে আসা পাখির ডাক। পতঙ্গের ওড়াউড়ি আছে। মানুষের পদশব্দ দূরে দূরে শোনা যায়। অন্ধকার কিন্তু স্তব্ধ করতে পারেনি জীবন সঙ্গীতের প্রবাহকে। ইতিউতি বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিও যে নেই, তাও নয়। তবুও ক্রমশ অন্ধকার নেমে আসতে থাকে তারাখচিত এই আকাশের নিচে।

কয়লাখনির চৌদ্দ নম্বর পিটের দূরত্ব রেল লাইন থেকে আধ মাইল।

কোলিয়ারির এই চৌদ্দ নম্বর পিটের রাত-শিফটের কাজ এইমাত্র শুরু হলো। সন্ধের শিফটের বেরিশভাগ শ্রমিক বাড়িতে চলে গেছে। ওদের মন ভালো নেই। যে কোনওদিন ওদের খনি বন্ধ হয়ে যাবে। দু'একজন হাজিরাবাবুর ঘরের সামনে বারান্দায় বসে গল্প করছিলো। যেমন মনু কাহার আর গোপীরাম মান্ডি। এবার ওরা বাড়ি যাবার জন্য উঠে পড়েছে।

মনু কাহার যাবে চৌদ্দ নম্বর পিট ছাড়িয়ে যে পাকা রাস্তাটা পুবে গেছে, সেটা ধরে। ওদের কোয়ার্টার পাকা রাস্তার ওপর বাজারের পাশে। মনু বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো।

গোপীরামও পিট বাউন্ডারি ছেড়ে হাঁটতে শুরু করেছে। ওর হাতে টর্চ। গোপীরাম মান্ডি পুরনো দিনের শ্রমিক। ধাওড়ায় থাকে। সে রোজ শর্টকাট রাস্তায় বাড়ি যায়। দিন হলে অসুবিধে থাকে না। রাতের বেলাতেই একটু কষ্ট। চিন্তিত গোপীরাম। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে সংসারের কী হবে। এ-সব ভাবতে ভাবতেই খনি বাউন্ডারি পাশ দিয়ে সে সরু পথ ধরে রেললাইনের দিকে চলেছে। এবড়েশ-খেবড়ো উঁচু-নিচু মালভূমির জমি। সে খনির সামনেকার জোরালো বিদ্যুতের আলো পেছনে ফেলে এসেছে অনেকটা।

.এবার বেশ অন্ধকারে পা রেখেছে গোপীরাম। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছে। রেলপথ কাছে চলে এসেছে। দেখা যাচ্ছিলো বিশাল এক মালগাড়ি চলছে তো চলছেই। হঠাৎ চমকালো গোপীরাম।

কৌন? কৌন হো তুম?

অন্ধকারে একটা মানুষের অস্পষ্ট চেহারা মনে হলো গোপীরামের। গোপীরাম টর্চের আলো ফেললো সামনের রাস্তায়। কাউকে দেখা গেলো না। আসলে রাস্তাটা নিচের দিকে অনেকটা নেমে গিয়ে ডাইনে ঘুরে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে গেছে। এতটা পথ না গেলে সে আর মানুষটাকে দেখতে পাবে না। গোপীরাম টর্চের আলো খুব একটা নেভালো না। জ্বালিয়েই রাখলো। পথের ঢালে নামলো পা টিপে টিপে। এবার পথটা এক মানুষ সমান নিচে নেমে গেছে। তাই তাঁদের খনি পিটের সেই জোরালো বিদ্যুতের আলোর তীব্র ছটা আড়াল পড়ে গেল। এবার যথার্থই অন্থকার। মালগাড়ি চলে গেছে অনেকটা দূরে। তবুও লাইনের ওপর গড়িয়ে চলা লোহার চাকাগুলোর ঘর্ষণের ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছিলো।

এক অদ্ভুত ধরনের ঠান্ডা নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে এখানে। একটা মানুষ যে তাঁর আগে আগে চলেছে, সেটা গোপীরাম মান্ডি বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু মানুষটাকে সে এখনো দেখতে পাচ্ছে না। প্রথমেই যা এক ঝলক দেখেছিলো। সোজাসুজি টর্চের আলো ফেললো সে। সেই বিরাট পাথরটায় আছড়ে পড়লো আলো। গোপীরাম এবার চোরে চিৎকার করলো—

কৌন-ন-ন-ন-ন-! তুম কৌন হো-ও-ও-ও-ও! বাতাও! আগে কে যেনঁছে বটে-এ-এ-এ-এ?

কোন সাড়া নেই। কিন্তু পদশব্দ আছে। পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে গোপীরাম খোলা জায়গায় পৌঁছলো এতক্ষণে। সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। রেলপথের হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎলাইনের খুঁটিগুলো দেখা যোচ্ছে।

হ্যাঁ। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখলো গোপীরাম। একই পথ দিয়ে মানুষটাও রেললাইনের দিকে এগোচ্ছে। গোপীরাম চ্যাচালো—

আরে এ ভাই-ই-ই-ই-ই! ঠারো না! কুথ্যকে যেনঁছে আপ।

লোকটা কথার উত্তর দিলে না। গোপীরাম দেখলো, মানুষটা টলতে টলতে সামনের দিকে হাঁটছে। রেললাইন কাছে চলে এসেছে। গোপীরাম নিজেই এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। ফের চিৎকার করলো সে—

তুম কৌন হো ভেইয়া?

কোনও উত্তর নেই।

লোকটা টলতে টলতে চলেছে।

গোপীরাম এগোচ্ছিল দ্রুত।

ট্রেনের শব্দ। গোপীরাম মান্ডি কান খাড়া করে শুনলো সামনের স্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছুটে আসছে। সে আরো জোরে চেঁচিয়ে লোকটা'কে সাবধান করার চেষ্টা করলো—

আরে ভাই-ই-ই-ই-ই! সামহাল কে! টেরেন আ রহা!

কিন্তু কে কার কথা শোনে! কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই মানুষটার। রেলপথের উঁচু অংশে সে ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

ট্রেনের হেডলাইটেরর আলো পড়েছে লোহার পাতের রেললাইনের ওপর। চকচক করে উঠেছে রেললাইন। হেডলাইটের সেই আলো ছুটে আসছে দ্রুত। লোকটার কি মাথা খারাপ! লোকটা কি কানে শুনতে পায় না? —এমনই সব ভাবনা আসছিলো গোপীরামের মনে।

ট্রেন হু-হু করে ছুটে আসছে। শব্দ হচ্ছে খটাখট্-খটাখট্। ট্রেনের কামরার আলোকিত জানালা-দরজাগুলো রেলপথের আশপাশকে আলো মাখিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। ট্রেন আরো কাছে। লোকটা ট্রেনলাইনের ওপর। প্রথম খালি লাইনটা টপকালো সে। গাড়ির শব্দ যেন গোপীরামের কানের ভেতর তুফান তুললো।

গোপীরাম ছুটলো লোকটাকে আটকানোর জন্য।

আরে এ ভেইয়া-আ-আ-আ-আ! মর যায়েগা তু! রুক্ যাও-ও-ও-ও-ও!

গোপীরামের চিৎকার ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে হারিয়ে যাচ্ছে। লোকটা দ্বিতীয় লাইন পেরলো। গোপীরাম ছুটে রেলপথের ওপরে উঠে এসেছে ততক্ষণে।

রুকো-ও-ও-ও-ও। রুক যাও-ও-ও-ও-ও! মর যাঁয়ে গা-আ-আ-আ-আ!

ট্রেন সামনেই। হেডলাইটের আলো পড়েছে লোকটার ওপর। গোপীরাম লাইন টপকে টপকে ওকে ধরতে গিয়ে জোর হোঁচট খেয়ে পড়লো। ছিটকে গেল হাতের টর্চ। গুঁতো লেগেছে পাঁজরায়। সে-সবে খেয়াল করলো না গোপীরাম। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলো। লোকটা তাঁর হাত দশেকের মধ্যে। ট্রেনের দূরত্ব পঁচিশ হাত। হেডলাইটের তীব্র আলোয় গোপীরামের চোখে ধাঁধা লেগে গেলো। হুড়মুড়িয়ে এসে গেলো ট্রেন।

আ-আ-আ-আ-আ-আ!

তীব্র মরণ চিৎকার শোনা গেল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না গোপীরাম। ট্রেনের জানালা-দরজা থেকে ছিটকে আসা আলো দ্রুতগতিতে সরে সরে যাচ্ছে। ছুটে চলা ট্রেনের খটাখট্ শব্দ। তার চল্লিশ সেকেন্ড পরেই অন্ধকারের কালো চাদর ঢেকে দিলো জায়গাটাকে। ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলে গেলো। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটা তখনো দেখতে পাচ্ছিলো গোপীরাম মান্ডি।

আকাশে অজস্র তারার ভিড়। সামনে রেলপথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে আরো বহু জনপদের দিকে। যেমন অন্ধকার এখন, তেমনই নৈঃশব্দ চরাচরে। গোপীরাম একা দাঁড়িয়ে। সামনেই মানুষটা পড়ে আছে। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে লাইনের পাশে।

টর্চটা হারিয়ে ফেললো গোপীরাম। খোঁজার চেষ্টা করলো কিছুক্ষণ। ফেলো না অন্ধকারে।

ম্যায় কেয়া করু? মনে মনে নিজেকেই বললো গোপীরাম। লোকটাকে ফেলে চলে যাবো! এমন অবিবেকি কাজ করতে মন চাইছে না তাঁর।

কিন্তু কি-ই বা করার আছে আমার? লোকটা মরেই গেছে। লোকটা মরবে ঠিকই করেছিলো। তাকে আর বাঁচাবে কেমন করে? আর কয়লা খাদানের মানুষদের বেঁচে থেকেই বা কী হবে?

গোপীরাম মান্ডি ভাবলো এক মিনিট। তারপর এগলো দলা পাকিয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। ওর নিজের মনটাও কুঁকড়ে যাচ্ছিলো।

দুই

কেমন একটা গন্ধ! এ কি মৃত্যুর গন্ধ? পড়ে থাকা লোকটার কাছে এসে গোপীরাম সেইরকমই এক আশ্চর্য গন্ধ পেলো। ঝুঁকে লোকটাকে খুব কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু বেশ ঘন অন্ধকার। লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে গোপীরামেরই মতো গায়ের রঙ। চেহারাও সে-রকমই। পরনের জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার।

দু'-একবার ইতস্তত করে গোপীরাম লোকটাকে হাত দিয়ে ঠেলা দিলো।

আচমকাই যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো লোকটা। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলো গোপীরাম। লোকটা বেঁচে আছে! আশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হয়!

লোকটার পাশে উবু হয়ে বসে গোপীরাম তাকে চেনার চেষ্টা করছিলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গোপীরামের মনে হলো, তাঁরই মতো বয়স হবে লোকটার। সাঁওতালও হতে পারে। কারণ, গায়ের রঙ কালো তার।

গোপীরাম লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, যাদা দর্দ

হ্ঁইএগুছে বটে? .

সে গুঙিয়ে উঠলো। ওর হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছে। ওখানে প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে। লোকটা এখন সমানে গোঙাচ্ছে। গোপীরাম তাকে সোজা করে বসাবার চেষ্টা করলো। লোকটা কিছু বলতে চাইছে।

গোপীরাম কান পেতে তার কথা শোনার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। গলা দিয়ে ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। তবুও তার মধ্যে থেকেই দু'একটা কথা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে। খুব চেনা কণ্ঠ। এই গলা কার? গোপীরাম চোখ বুজে মনকে একমুখি করে স্মৃতির জলাধারে ডুব দেয়। কিন্তু কিছুতেই ওর মনের মুঠোয় কোন মানুষের মুখ ধরা পড়ে না। কিছুতেই না! কিন্তু এ যে বড় পরিচিত কণ্ঠ। মানুষটা তা'হলে কে?

পানি..........ডগদর..........দরদ.......হা ভাগোয়ান..........রোটি ক্যায়সে মিলেগা!

এইসব টুকরো টুকরো কথা। গোপীরাম বুছতে পারে, মানুষটাকে একটু জল খাওয়ানো দরকার। ওর চেষ্টা পেয়েছে। ওর কষ্ট হচ্ছে। বোধহয় ওর খিদেও পেয়েছে। এখানে জল কোথায়? ডাক্তারই বা কোথায়? কি করবো আমি?— গোপীরাম ভাবছিলো।

মানুষটা কাতরে উঠছে। যন্ত্রণায় তার শরীর ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে।

গোপীরাম মনটা কেমন করে ওঠে। বড্ড কষ্ট হয়। ট্রেনে ধাক্কা খেয়ে লোকটা বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য! সে মনটাকে ঝটকা দিয়ে দোনামোনা চিন্তা ঝেড়ে ফেললো। ঠিক করলো, লোকটাকে স্টেশনের কাছে হাসপাতালটায় নিয়ে যাবে।

তাকে সে পাঁজাকোলা করে তোলার চেষ্টা করলো। আবার সে সেই আশ্চর্য গন্ধটা পেলো। লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তোলামাত্রই সে গোপীরামকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছে। এবার গোপীরামের শরীরটা হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। একটা শিহরন! কেন এমন হলো? গোপীরাম বুঝতে পারে না। আশ্চর্য!

ইঞ্জিনের বাড়ারের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে কপাল ফেটে গেছে। কপাল থেকে রক্তের ধারা নাকের পাশ দিয়ে গলার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার অনেকটা সয়ে গেছে গোপীরামের। রক্তাক্ত মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখে সে চিনে নেবার চেষ্টা করে চলেছে সমানে। রেললাইনের পাশের খোয়া পাথরে থেঁতলে গেছে লোকটার গালের বাঁ দিক। ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে বীভৎস রকমের কালো হয়ে গেছে জায়গাটা। ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে রক্ত ঝরছে এখনো। রক্তমাখা থ্যাঁতলানো মুখ দেখে মানুষটাকে সে কিছুতেই চিনে নিতে পারলো না। তবুও তাকে ভীষণ চেনা লাগছে। খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে গলার স্বর। তা' হলে কে সে?

কয়লা খাদানের শ্রমিক গোপীরাম মাণ্ডির পেটাই চেহারা। শক্তি রাখে সে সাঙ্ঘাতিক। সে আর নিজেকে চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় ঝুলিয়ে রাখতে চাইলো

না। পাঁজাকোলা অবস্থা থেকে ঝটকা মেরে লোকটাকে ডান কাঁধে তুলে নিলো। ঝাঁকুনির চোটে লোকটা ফের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। চমকে গেল গোপীরাম। মনে হলো এ যেন তারই গলা। প্রচন্ড যন্ত্রণায় বুঝি সে-ই সাঙ্ঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে।

রেল স্টেশন আধ মাইলের মতো। গোপীরাম রক্তাক্ত-বিধ্বস্ত মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

রেললাইনের পাশের সরু পায়ে চলা রাস্তা ধরে সে চলেছে। কাঁধে মুমূর্ষু মানুষটা। মাঝে মাঝে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে। তখনই গোপীরাম জিজ্ঞেস করছে, খুব দর্দ হঁইএছে বটে?

হাঁ, বহুৎ দর্দ। আ-আঃ!

সবুর সবুর! হাসপাতাল যেঁনছি ত তুমাকে লিয়ে।

ডগদর, অসপাতাল! ডগদর! ভুখ! দর্দ!

এরকম অসংলগ্ন কথা বললেও অবশ্য এখন কথা বলছে লোকটা। গোপীরাম চলতে চলতে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে বয়ে নিয়ে যাবার কষ্ট ভুলে থাকার জন্যও গোপীরাম কথা বলছিলো।

তুমার নাম কি বটে?

হম্-হম্-হমার নাম —আঃ!

খুব কষ্ট! খুব দর্দ? থোরা সা ইন্তেজার করো। ডাক্তার মিলবে হাসপাতালে। তুমার ঘর কুথাকে?

ঘর-মকান-হেথাকে।

ঠিক আছে। ঘাবড়াও মৎ। হামি আছি বটে।

চলতে থাকলো গোপীরাম। লোকটার কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত তাঁর জামা রক্তাক্ত করে ফেলেছে। একটা বাঁক পেরনোর পর এবার দেখা যাচ্ছে স্টেশনের আলো। সেখানে গেলে অনেক আলো আর জলও পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে অনেক মানুষ। চলেছে কয়লা খাদানের শ্রমিক গোপীরাম মান্ডি। কাঁধে অপরিচিত ঐক মুমূর্ষ মানুষ। কথা চালিয়েই যাচ্ছে সে।

এখ্যন ক্যামন লাইগছেঁ?

হাঁ। দর্দ, ভুখ, পানি।

ঠারো, ঠারো। টিসন পর মিল যায়ে গা পানি। তুমার নাম কি আছে বটে? বুল ত!

গা-গো-গ-গো—।

গোপাল? গণেশ? গিরিধারী?

ন্-না!—লোকটা মাথা ঝাঁকায়।

গোপীরাম এভাবেই নানারকম প্রশ্ন করতে করতে চলতে থাকে। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম কাছে চলে এসেছে। আর দু'তিন মিনিট হাঁটলেই সে প্লাটফর্মে উঠে পড়বে। সার দিয়ে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে প্লাটফর্মে।

মুমূর্ষু মানুষটা গোপীরামের গলা জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে। একটু অসুবিধা হচ্ছিলো বটে তাঁর। কিন্তু মৃতপ্রায় লোকটাকে তো আর কষ্ট দেওয়া যায় না।

প্লাটফর্মে উঠে চলার গতি বাড়ালো সে। প্লাটফর্ম নিস্তব্ধ। সার দিয়ে আলো জ্বলছে। একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। এখন কত রাত হলো? এমন ফাঁকা কেন স্টেশনটা? আশ্চর্য তো!

জলের কলগুলোই বা কই? অবাক গোপীরাম ফের কাঁধের মানুষটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো।

কেয়া ভাই! আভি ক্যায়সা লাগতা?

লোকটার গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ানি ছাড়া আর কিছু বেরলো না। ক্রমশ চুপ করে যাচ্ছে মানুষটা। তাই একা একাই কথা চালিয়ে যেতে লাগলো গোপীরাম।

এভাবে কথা বলতে বলতে গোপীরাম মান্ডি লোকটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে লাগলো। তার মনে হচ্ছিল, সেই বোধহয় রক্তাক্ত, আহত। মানুষটার ভারে তার ঘাড় ভেঙে পড়তে চাইছে এবার। মানুষটার হাতদু'টো তাঁর গলায় সাঁড়াশির মতো আটকে বসেছে যেন।

স্টেশন প্লাটফর্ম জনশূন্য দেখে গোপীরাম সময় নষ্ট করলো না। সে টিকিট ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে পাকা রাস্তায় পড়লো।

হাঁটতে লাগলো হাসপাতালের দিকে। স্টেশন রোড ধরে দু'মিনিট হেঁটে এবার ডানদিকের রাস্তা ধরলো। এ-পথেই হাসপাতাল। আচমকাট কাঁধের লোকটার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল। ক্রমাগত। থামছে না।

কেয়া হুয়া? বহোৎ দর্দ?

কোন উত্তর নেই। লোকটার আর্তস্বর গোপীরামের কানের ভেতর দিয়ে যেন বুকের মধ্যে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘড়ঘড় শব্দটা বুঝি তার বুকের ভেতরই হচ্ছে।

বড্ড ছটফট করছে মানুষটা। কোনোভাবেই স্থির থাকেতে পারছে না গোপীরাম। ওই যে হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে। কাঁধের মানুষটাকে নিয়ে প্রায় দৌড়াচ্ছে গোপীরাম।

লোকটা যে পাগল হয়ে উঠেছে! গোপীরামের গলাটা সে সবলে দু'হাতে চেপে ধরেছে। দমবন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। হাসপাতাল গেটের কাছে চলে এসেছে সে। কিন্তু লোকটার দু'হাতের দশটা আঙুল চেপে বসেছে গোপীরামের গলায়। গোপীরামের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাসপাতাল-গেটে পা রেখে সে সর্বশক্তি

জড়ো করে ঝট্‌কা দিয়ে লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে চাইলো।

পারলো না। মানুষটার দশ আঙুল তাঁর গলায় একেবার বসে গেছে। কণ্ঠনালীতে ঢুকে গেছে বুড়ো আঙুল-দু'টোর নখ। কাঁধের মানুষটাকে নিয়েই গোপীরাম সশব্দে আছড়ে পড়লো শানবাঁধানো হাসপাতাল চত্বরে।

প্রথমে গোপীরামের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এবার তাঁর এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। মনে হচ্ছিলো লোকটা যেন তাকে আঁকড়ে ধরে তার শরীরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তাঁর কাঁধের ওপর থাকা মানুষটার আলাদা অস্তিত্ব আর নেই। গোপীরামের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলেও সে বেশ হালকা ও ভারমুক্ত হয়ে গেছে। গোপীরাম এখন একা। কোথাও কেউ নেই। চরাচর নিঃশব্দ।

পরের দিন সকালে সবাই দেখলো, হাসপাতাল চত্বরে গোপীরাম মান্ডির মৃতদেহটা নিথর পড়ে আছে। মনু কাহার ছাড়াও আরো অনেকে এসে শনাক্ত করলো তাঁকে। তার চোটলাগা হাঁটুতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কপাল ফেটে রক্তের ধারা নাকের পাশ দিয়ে থুতনি ধরে গলা অবধি নেমেছে। গলায় ক্ষতচিহ্ন। জামা-প্যান্ট ছেঁড়া-খোঁড়া।

সেদিন গোপীরামদের কয়লাখনিও বন্ধ হয়ে গেল।

ফাঁদ

আমার তো বছরখানেক চাকরি আছে। চাকরি গেলে কোয়ার্টারও যাবে। তখন এখান থেকেই পাততাড়ি গোটাতে হবে। তার আগে সুদীপের একটা ব্যবস্থা করা খুবই দরকার।

তারপর কি চন্দননগরের বাড়িতেই পাকাপাকি থাকবে ভাবছো?

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সুমন্তবাবু বললেন, একটা আস্ত বাড়ি যখন আমাদের আছে, তখন আর নতুন করে অন্য চিন্তা করতে যাবো কেন?

ঠিকই। তবে এখানে তোমার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেটা তো চন্দননগরে নেই। ওখানে তোমার ভালো লাগবে কিনা, তাই আমি ভাবছি।

সেটা যে আমি ভাবছি না, তা নয়। আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে আমি নেই, এ-কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

কয়লাখনির সার্ভেয়ার সুমন্ত বিশ্বাস কর্মজীবনের শেষবেলায় প্রায়ই স্ত্রী বিভাবতীর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করেন। আজও তাই করছিলেন। এমন সময় ছেলে সুদীপ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

কি হলো! হাঁপাচ্ছিস কেন এমন?

শঙ্করদয়ালের মেজ ছেলেটার বাড়াবাড়ি রকমের ডায়েরিয়া হয়েছে। হাসপাতালে

নিয়ে যেতে হবে।

শঙ্কর কি বাসায় ফেরেনি?

না।

সুদীপ ঘরে ঢুকে ভদ্রস্থ জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে ছুটলো রাস্তায়। তাই দেখে ওর মা বিভাবতী স্বামীকে বললেন, একেবারে ঠিক তোমার যৌবন বয়সের মতো। লেবার ধাওড়ার মানুষজনের বিপদে-আপদে এভাবেই ছোটাছুটি করতে তুমি।

হ্যাঁ। তবে আমি তখন চাকরি করতাম। আর সুদীপ বেকার। এটাই তফাত।

তাছাড়া তুমি তো থেকে নেই! তোমার সেই কাজ সমানে চলছেই। তাই দু'রকম ভাবনা মনে উঁকি দেয়।

কি?

এক, এই বয়সে এমন শারিরীক আর মানসিক পরিশ্রম কতদিন সইবে? দুই, যদি চন্দননগরে চলে যাই, সেখানেই বা কতটা মন টিকবে?

হাসলেন সুমন্তবাবু। বললেন, যত কাজের মধ্যে থাকবো, শরীর ততই ভালো থাকবে। একবার বসে গেলেই ব্যস! শরীরে হাজার রোগ ঢুকে গোলযোগ বাঁধিয়ে ফেলবে।

রবিবার ছুটির দিনেও দেখছি রেহাই নেই। কি সব কাগজপত্র নিয়ে বসেছো?

ধেমো মাইন্সে লেবারদের গ্র্যাচুইটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে একেবারে কেলেঙ্কারি অবস্থা চলছে। লেখাপড়া না জানা যে-সব লেবার অবসর নিচ্ছে, তাদের টিপছাপ নিয়ে পুরো পেনশন-গ্র্যাচুইটির টাকা তুলে নিচ্ছে মাঝারি অফিসাররা। তারপর বয়স্ক লেবারগুলোর হাতে দশ-কুড়ি হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে গ্রামের বাড়ির ট্রেনে তুলে দিচ্ছে।

এ-সব কথা তো রোজই শোনা যাচ্ছে। ওপরতলার লোকজন কিছু বলছে না?

আরে ওপরতলার মদতেই তো হচ্ছে এ-সব। নিচুতলার কেরানীরা সেভাবেই কাগজপত্র তৈরি করে ঝটপট ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছে। শ্রমিকদের হকের লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ওপরতলার অফিসাররা তা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে।

ওঃ! পৃথিবীতে কি ন্যায়-নীতি বলে কিছু থাকবে না?

দ্যাখো, তোমার পাওনা, তোমার হক, তোমার অধিকার ছিনিয়েই নিতে হবে। কেউ তোমাকে দয়া করবে না। কোলিয়ারি বেল্টে শ্রমিক আন্দোলন করে এই সার সত্য কথা আমি যেমন বুঝেছি, বুদ্ধিমান শ্রমিকরাও তা বোঝে। তাই শয়তানগুলো বেছে বেছে বোকা অশিক্ষিতগুলোকেই বধ করে। এমন একটা কেসের একেবারে জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে। লেবার অফিসার বিলাসদেও সিংকে তো তুমি চেনোই।

হ্যাঁ। দু'একবার তোমার এসেছে তো!

ও ব্যাটা কত শ্রমিকের যে লাখ লাখ টাকা মেরে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে একটা কেসে সে হাতেনাতে ফেঁসেছে। আমি রিটায়ার হবার আগে ওর অন্তত শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবো।

চিন্তায় মরে যাচ্ছিলো বিলাসদেও সিং। তার নামে গোটা চারেক তদন্ত চালাচ্ছে ভিজিলেন্স। এর মধ্যে একটার যাবতীয় প্রমাণ তার দপ্তর আর ব্যাঙ্ক থেকে কৌশলে বের করে নিয়েছেন সুমন্ত বিশ্বাস। মোক্ষম কেস ফাইল হয়েছে ধেমো কোলিয়ারির অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক মহেশ ভাণ্ডারির পেনশন গ্র্যাচুইটির প্রায় পাঁচ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনায়। ওর স্যাঙাৎ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাও বলেছে। সবার একই কথা—তুমি পিছলে যাবার উপায় বের কর। আমরা তাতে সাহায্য করবো। সরাসরি এই কেসে আমরা ঢুকবো না। আমরা আগ বাড়িয়ে এগোলেই শ্রমিক সংগঠনগুলো চেঁচিয়ে উঠবে—এই যে, এরাও চোরে শাকরেদ।

বিলাসদেও ঝানু লোক। প্যাঁচ-পয়জারের একশো ভাগ জানা আছে। এদিন সুমন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়েছিলো সে। ভেবেছিলো মোটা টাকার লোভ দেখাবে। কিন্তু চা খাইয়েই পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন সুমন্ত বিশ্বাস। কোনো কথা বলার সুযোগই দেননি। কোন পথে এগোবে, তাই ভাবছিল বিলাসদেও।

একটা হট্টগোলের আওয়াজ পেয়ে বিলাসদেও বাইরে তাকালো। দেখলো গোটা দশ পনেরো শ্রমিকের জটলা। সে ডাকলো, ভজুয়া!

ভজুয়া ছুটে এলো। জী-সার!

তর্জনি তুলে জটলার দিকে ইঙ্গিত করে বিলাসদেও বলল, দেখো তো, কেয়া হুয়া!

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এলো ভজুয়া।

কেয়া-হুয়া?

শঙ্করদয়ালের লেড়কার বুখার হঁইএগুছে। বাড়ি থিক্যে খবর পাঠাইএগুছে।

ও আচ্ছা। ঠিক হ্যায়।

সুমন্তবাবু কা লেড়কা ভি আছে উখ্যানে।

হুঁয়াপর হ্যায়?

হাঁ জী।

সুমন্তবাবুর ছেলে এখানে এসেছে শুনে বিলাসদেওর মনের মধ্যে নিমেষে অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল।

ভজুয়া!

হাঁ জী!

সুমন্তবাবুকে লেড়কাকো বুলাও মেরে পাস।

জী।

দু'মিনিটের মধ্যেই ভজুয়া সুদীপকে সঙ্গে নিয়ে বিলাসদেওর অফিসে ঢুকলো।

আরে এসো এসো! তুমি তো হামাদের অনারেবল মিস্টার সুমন্ত বিশওয়াসের লেড়কা আছো জানলাম। নাম কেয়া তুমহারা? কি প্রবলেম হয়েছে?

আমার নাম সুদীপ। আপনার লেবার শঙ্করদয়াল মিশিরের ছেলের ডায়েরিয়া হয়েছে। খুব মারাত্মক। আমরা ছেলেটাকে হাসপাতলে ভর্তি করে দিয়েছি। শঙ্করদাকে খবর দিতে ওলাম।

ঠিক আছে। হামি শঙ্করকে খবর পাঠিয়ে ওর ছুটি করে দিচ্ছি। একঠো গাড়ি দিয়ে হসপিটাল পাঠাচ্ছি। তুম বৈঠো। তুমি ভেরি নাইস বয়। মানুষের উপকার করছো! নোকরি করছো কি?

না, না।

সে কি! এডুকেশন কিতনা হুয়া?

বি কম গ্র্যাজুয়েট। দু'বছর হয়ে গেল।

আভি তক নোকরি না মিলি? বড়ে আপসোস কি বাত!

চুপ করে রইলো সুদীপ। চাকরির জন্য সে কম ছুটোছুটি করছে না। কিন্তু কোথায় চাকরি? বাবা কারুর কাছে হাত পাতবেন না। তাঁর সবসময় একই কথা। চেষ্টা করো। নিজের যোগ্যতাতেই পেয়ে যাবে। বাদবাকিটুকু আমি দেখবো। সুদীপ সত্যিই খুব মনমরা হয়ে আছে ইদানীং। এইসব সামাজিক নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে হতাশা ভুলে থাকতে চায়।

আরে ভজুয়া, দো কাপ চায়ে লে আও তো!

চা খাওয়া হলো। বিলাসদেও এবার নিজের কাজ শুরু করে দিলো।

নওজওয়ান লেড়কা। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হলো। ফিন দু'বছর বসে আছো? তাজ্জব কি বাত! তোমার বাবা কিছু বেবোস্তা করছেন না?

বাবা নিজেই অসুস্থ। রিটায়ার হবার টাইম হয়ে গেছে। আর জানেনই তো। বাবা একরোখা মানুষ। আদর্শ নিয়ে চলছেন। কাউকে হাতে পায়ে ধরবার লোক নন।

হাঁ, সে তো সহি হ্যায়। সুমনত বিশওয়াস ইজ আ আইডিয়াল মান। বাট নেক্সট জেনারেশনের বেবোস্তা তো তাঁকে কোরতে হোবে! তাই না?

হ্যাঁ। বাবা-মা পড়াশোনা করিয়েছেন। তাঁদের দায়িত্ব—

আরে বাবা, আজকের দিনে তাই কি শেষ কথা হোলো? যাঁর যেখানে সুবিস্তা আছে, লেড়কা-লেড়কিওকে লিয়ে তো তাঁকে বোলতে হোবে। আই সি! একঠো বাত মনে হোলো।

কি কথা?

তোমার বাবা তো অসুস্থ আছেন। উনাকে মেডিকেল গ্রাউন্ডে আনফিট করিয়ে তোমার ই সি এল পর নোকরি হো সকতা।

বাবা তাঁর মরালিটির বাইরে যাবেন না।

এতো মরালিটি কি এ-যুগে চলবে ভাই? তোমাকে হামি একঠো মতলব দিচ্ছি।

বলুন।

তুমি তোমার বাবাকে এহি ব্যাপারটো সমঝাও। উনকো হসপিটাল পর ট্রিটমন্টে জারি আছে, এমন রেকর্ড করিয়ে রাখখো। শুনো, একঠো কাম ম্যায়নে কর সকতা।

কি কাজ?

কাল্লা কোলওয়ারি হসপিটাল কো ডগদরলোককে সাথ যাদা দোস্তি হ্যায় হামারা। কোই বাত নেহি। সুমন্তবাবুকো ট্রিটমেন্টকা কাগজ হাম কর দুঙ্গা।

বিলাসদেও কতার তোড়ের মুখে সুদীপ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বিলাসদেওর এমন আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ কথা আর পরামর্শে যে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ল।

ঠিক হ্যায় বেটা। আমাকে দোরকার পড়লে চলে আসবে এই অফিসে।

দুই

রাত বারোটা বাজে। বাড়ি নিস্তব্ধ। সুদীপ তার ঘরে বিছানায় জেগে বসে আছে। চোখে ঘুম নেই। বিছানার পাশে জানালাটা খোলা। বহু দুরে একটা খোলামুখ খনির পাহাড় সমান ঢিবি দেখা যাচ্ছে। তার বিদ্যুতের তীব্র আলোগুলো সার দিয়ে জ্বলছে। ভারী ভারী ট্রাকগুলো কয়লা বোঝাই হয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটছে গজন করতে করতে।

সুদীপের মন ভাল নেই। আজ রাতে বাবার সঙ্গে তার বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাঁর মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে সুদীপের চাকরির প্রসঙ্গ তুলতেই সুমন্তবাবু নিজেবে ঠিক রাখতে পারেননি। স্বেচ্ছা অবসরপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের ইউনিয়ন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ তিনি যদি স্বেচ্ছা-অবসর নেল, হাজার হাজার শ্রমিকের সামনে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন? এই ছিল সুমন্তবাবুর মন্তব্য।

সুদীপ বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, সহজভাবে যে চাকরিটা হয়ে যাওয়া সম্ভব, সেটা হাতছাড়া করবো? তাছাড়া বিলাসদেও যে বাস্তবতার কথা সুদীপকে বুঝিয়েছিল, সুদীপ সেটাই ওর বাবাকে বলার চেষ্টা করেছে।

এই কথার উত্তরে সুমন্ত বিশ্বাস সুদীপকে বলেছিলেন, তুই তো একেবারে মাইনিংয়ের করাপটেড অফিসারগুলোর মতোই কথা বলছিস। ওরাও আমাকে একই লোভ দেখায়। আমি জানি, আমি স্বেচ্ছা-অবসর নিলে ওরা খুব দ্রুত আমার

পেনশন আর গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা করে দেবে। ছেলের চাকরিও দিয়ে দেবে। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে আমার মুখ। স্বেচ্ছা-অবসরের বিরুদ্ধেই আমরা। পেনশন-গ্র্যাচুইটি নিয়ে যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি চলছে, বলতে গেলে সেই গ্রাউন্ডে আমরা অনেক বদমাইশ অফিসারকেই টাইট দিয়ে দিয়েছি। অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছি। আমি না থাকলে তো ওদের পোয়াবারো।

তুমি না থাকলে কি শ্রমিকদের আন্দোলন থেমে যাবে নাকি!

চুপ্ কর তুই! তুই তা হলে চাস, আমি শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে যাই! নিজের স্বার্থগুলো ষোলআনা পূরণ করে নিই। তোর এমন মতিগতি হলো কি করে!

দু'বছর বেকার বসে থাকলে কঠিন বাস্তব একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ে।

উনষাট বছরের শ্রমিকনেতা সুমন্ত বিশ্বাসের মাথায় আগুন জ্বলছিল ছেলের এ-সব কথা শুনে। তিনি নিজেকে সামলাচ্ছিলেন। তখনই মোক্ষম কথাক'টা বলেছিলো সুদীপ।

বুঝলে বাবা, তোমার কষ্ট হতে পারে। তবু রিয়ালিটির কথা বলি। ই সি এল একের পর এক কয়লাখনি বন্ধ করবেই। শ্রমিক কর্মচারীদেরও স্বেচ্ছা অবসর নিতে বাধ্য করবে। দেখছি তো! যে কাজটায় ওরা খুব বাধা পায় তখন কিছুদিন চুপ করে থাকে। তারপর নিঃশব্দে সেই কাজটা করে ফেলে। আমার তো মনে হয়, যে সব সুযোগ-সুবিধা ওরা দিচ্ছে, সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়াই ভালো।

এই কথায় প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়েছিলেন সুমন্তবাবু। তাঁর হাঁপানির টানও বেড়ে গিয়েছিল। বিভাবতী দেবী ছুটে এসে ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে স্বামীর শুশ্রূষা শুরু করেন। তারপর থেকেই বাড়ির পরিবেশ থমথমে হয়ে গেল। হাঁপানিতে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন সুদীপের বাবা। ইনহেলার নিয়ে আর ওষুধ খেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অনেক রাত অবধি জেগে ছিল সুদীপ। আজকে তার বাবার সঙ্গে যে মানসিক দূরত্ব জন্ম নিলো, তা আর কমলো না কোনদিন।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিলাসদেও খবর পেলো, ভিজিলেন্স শিগগিরই ব্যাঙ্কের আসানসোল ব্রাঞ্চে আসছে। সেখানে তদন্তের কাজে অগ্রগতি বুঝে তাঁরা ধেমো মাইন্স অফিসে হানা দেবে। দিল্লিতে কোল ইন্ডিয়ার দপ্তরে বিলাসদেও সিং-এর যারা 'বন্ধু' আছে, তারাই আগেভাগে এ-খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।

চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো বিলাসদেও। নিজের মাথার চুল নিজে ছেঁড়ার জোগাড় তার।

বাড়ি ফিরে সে ফোন কাল্লা হাসপাতালে।

হ্যালো।

হাঁ, হামি ধেমো মাইন্স কোয়ার্টার থেকে লেবার অফিসার বিলাসদেও সিং বলছি। তপন হালদার সিট পর হ্যায় কেয়া?

মুহূর্তের মধ্যেই তপন হালদারের গলা। —বলুন বিলাসবাবু, খবর কি?

সুমন্তবাবুকো ট্রিটমেন্টকা কাগজ রেডি?

সে-সব আগেই হয়ে গেছে। আপনারই তো খবর নেই।

ঠিক আছে। ভেজ দো কাগজ।

আমার কেসটা মনে আছে তো?

হাঁ।

পরের দিন সকালেই লোক পাঠিয়ে কায়দা করে সুদীপকে অফিসে ডেকে নিয়ে এলো বিলাসদেও।

সুদীপ যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, দেখেই বুঝলো সে।

আরে জুনিয়ার বিশওয়াস, হুয়া কেয়া?

বাবার সাথে মতে মিলছে না। ঝগড়া হলো। বাবারও শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। মন ভালো লাগছে না।

আরে ইয়ার! এনজয় করো। সব ঠিক হো যায়ে গা।

মনের এই অবস্থায় কি আর এনজয়ের কিছু থাকে?

সুদীপের পিঠ চাপড়ে দেয় বিলাসদেও সিং।

আরে ভাই, প্রবলেম আয়ে গা। উসকো সলভ্ করনে হোগা। এহি তো বাত হ্যায়।

মেডিক্যাল আনফিট দেখিয়ে বাবা আমার চাকরির জন্য কর্তৃপক্ষকে বলবেন না। এই নিয়ে ঝগড়া, আর ঝগড়া থেকে দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এটা আমি চাইনি।

বাপ-ছেলের মধ্যে ফাটল ধরাতে পেরেছে—এটা ভেবে মনে মনে খুশি হয় বিলসেদেও।

সুদীপ প্রাণ খুলে কথা বলে বিলাসদেওয়ের সঙ্গে। তার বারবার মনে হয়, বিলাসদেও তার মানসিক অবস্থা বা সমস্যা এমন সুন্দর বোঝে, যা তার বাবা বুঝতেই চান না। বাবা নাকি সারাক্ষণ সুদীপেরই চিন্তা করেন—মায়ের এই বক্তব্যও মানতে নারাজ সে। তাই যদি হতো, বাবা মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে এক্ষুনি তার চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন। তা তিনি করেননি। এর থেকেই তাঁর আন্তরিকতা বোঝা যায়।

এর পরের দিন নিজেই বিলাসদেওয়ের কাছে যায় সুদীপ। ও ভাবে, বিলাসদেওয়ের সঙ্গে লেগে পড়ে থাকলে একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। সেদিনই

বিলাসদেও সুদীপকে তার বাবার হাসপাতালে চিকিৎসার নকল কাগজপত্র দিয়ে দেয়। হাসতে হাসতে বলে, দেখো জুনিয়ার বিশওয়াস, হামি কেমন তুরন্ত কাজ করি।

কিন্তু এ সব কাগজপত্র দিয়ে কি হবে! বাবা তো মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে নিজেকে আনফিট বলবেন না!

হামি একটা কোথা ভাবছি। লেকিন তোমার এত সাহস হোবে না।

কি কথা? তুমি টু'মরো এখানে চলে আসো মাই বয়। হামি দেখছি কি কোরা যায়।

পরের দিন সন্ধ্যায় সুদীপকে নিয়ে বিলাসদেও তার কোয়ার্টারে গেল। এখানে সে একাই থাকে।

বন্ধুর মতো কথা বলছিলো বিলাসদেও। সুদীপ চিন্তা করছিলো, এমন বন্ধুর মতো বাবাকে সে কোনদিন পায়নি। বাবা-মা যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মায়ের যত্ন সে পেয়েছে । কিন্তু বাবা সারাজীবন খনি শ্রমিকদের নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ঘরে থেকেছেন, খনি শ্রমিকদের সমস্যা, ইউনিয়নের নানা ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থেকেছেন। বাবার মনটা সে কখনো ছুঁতে পারেনি।

সুদীপ ভাবছিলো, এই যে বিলাসদেও সিং—ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রুচির মানুয, তবুও তার মনটা বুঝি ছোঁয়া যাচ্ছে।

ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় বের করে গ্লাসে ঢেলে দিল বিলাসদেও।

ঠাণ্ডা পি লো। খুশ রহো। বলে হো হো করে হেসে উঠলো সে।

শুনো জুনিয়র বিশওয়াস। কুছ কোরতে সিনা মে এক্সট্রা তাকত লাগে। এমনি এমনি হোয় না।

বলুন না, কি করতে হবে!

ঠারো ঠারো। ইতনা জলদির কুনো ব্যাপার নেহি।

না, না। আমাকে যা কিছু তাড়াতাড়িই করতে হবে। আমার মন একদম ভেঙে যাচ্ছে।

দিল আচ্ছা রাখনে কে লিয়ে আচ্ছা চিজ তো হ্যায়ই। পিয়ো গে? হ্যায় তুমহারা তাকদ?—বলেই সে ফ্রিজ থেকে মদের বোতল বের করলো। গ্লাসে ঢাললো। বললো, সরাব পিনে কা তাকদ হ্যায় তুমহারা?

দ্বিরুক্তি না করে উদ্‌ভ্রান্ত সুদীপ জেদের বশে গ্লাসের সবটুকু মদ গলায় ঢেলে দিলো।

পুজো-পার্বণে শখ করে একটু-আধটু মদ খেলেও এভাবে যে এক গ্লাস মদ এক চুমুকে খেয়ে নেবে, এ তো তার স্বপ্নেরও অতীত। গলা-বুক জ্বলে যাচ্ছিল তার। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। ভীষণ কষ্ট! বিলাসদেও বুঝেছে, আনকোরা ছেলের

পক্ষে এই যথেষ্ট। মনের মধ্যে অভিমান, হাহাকার, গলায় বুকে জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে সুদীপ অন্ধকারের আরো অতলে নামতে লাগলো। সমস্ত স্বাভাবিক বোধ থেকে সে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিল।

বিলাসদেও চুপচাপ বসে আছে। সে দেখছিল সুদীপের মধ্যে মদের প্রতিক্রিয়া কি রকম হচ্ছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ওর গলা-বুকের জ্বালা কমে গেছে। মাথাটা খুব হালকা লাগছে। কোন কষ্ট নেই। কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা সবকিছু। ওর আশেপাশে যেন কেউ নেই। আত্মীয়স্বজন নেই। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বিলাসদেও ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

আরে বাচ্চে, ডর কা কুছ নেহি। হামি আছি তোমার সঙ্গে। কিন্তু একটা তাকদের কাজ কোরতে হোবে।

কি কাজ?—সুদীপের চোখের সামনে সব কিছু ঘোলাটে লাগছে। তার মধ্যে বিলাসদেও সিং যেন পরম ভরসা। বিলাসদেও নেশাগ্রস্ত যুবকটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। যুবকের মনে হচ্ছিল, সে যেন ভগবান। তার সব কথা পালন করার জন্য সে প্রস্তুত।

বিলাসদেও ফের তার কাজ শুরু করলো। সে খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছিলো।

সুদীপ, ভাই, শুনো।

বলুন।

তোমার বাবা অ্যাজমার পেশেন্ট আছে। এখন তো বুখার যাদা হয়েছে?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার সাথে কথা বলেন না। খুব নিষ্ঠুর।

তাই বোলছি, মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে তো তোমার বাবা তোমার নোকরির জন্য চেষ্টা করবেনও না। এক বচ্ছোর পেরিয়ে গেলে সুমন্তবাবুর চাকরিও খতম। অ্যাজমার পেশেন্ট। এজ সিক্সটি। লাইফ তো শেষ হতে চললো সুমন্ত বিশওয়াসের। লেকিন জুনিয়ার বিশওয়াশ কো জিন্দেগি আভি স্টার্ট হুয়া।

ঘোলাটে চোখে নেশাগ্রস্ত সুদীপ শুনে যাচ্ছিল লোকটার কথা। সে ভাবছে, লোকটাকে। মানুষ, না ভগবান!

আজ যদি তোমার বাবা মারা যান? তোমার বাবা এখনো নোকরিতে আছেন। তাতেও ই সি এল-এ একজন এমপ্লয়ির একমাত্র লেড়কা হিসাবে তুমি নোকরি পেয়ে যাবে।

চাকরি পাবো?—টলে যাচ্ছিলো সুদীপ।

জরুর পাবে! — ওকে ধরে আছে বিলাসদেও।

কি করতে হবে?

বাবার ওষুধে এক্টু পয়োজন মিশিয়ে দেবে। অসুস্থ মানুষ, আরাম সে ভাগোয়ানকা পাশ চোলে যাবে। অ্যাজমায় কষ্ট হোবে না। তোমার চাকরি হোলে তোমার লাইফ তো সিকিওরড্ হোয়ে যাবে।

ঝট করে, খুব আস্তে আস্তে, দারুণ দৃঢ়তা নিয়ে শয়তান বিলাসদেও সিং কথাটা বলে দিলো। সেই শয়তান ক্রমশ সুদীপের মস্তিষ্কটা খেয়ে নিচ্ছিল।

সুদীপের শরীরটা পেঁচিয়ে ধরেছে যেন একটা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ।

তিন

রাত গভীর। রাতে সুদরপ একা। একা থাকলেই ওর মন থেকে সমস্ত সুখ-শান্তি-স্বাভাবিকতা উধাও হয়ে যায়। ক'দিন ধরে সে তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। এখন সে মাথার চুল দু'হাতে খামচে ধরে নিজেকে সামলাচ্ছিলো। ঘড়িতে মিষ্টি সুর তুলে রাত একটা বাজলো।

হঠাৎ সুদীপ বিশ্বাস উঠে দাঁড়ালো। ক'দিন ধরে মনের সাথে যুঝতে যুঝতে সে একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। এখন এই গভীর রাতে তার মন বলে সম্ভবত কোন কিছু আর অবশিষ্ট ছিলো না। সে হঠাৎই যন্ত্রের মতো আচরণ শুরু করলো।

সে নিজের ঘরের আলমারিটা খুলে ফেললো। তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করলো ছোট একটা শিশি। যে ঘরে ওর বাবা ঘুমিয়ে ছিলেন, সে ঢুকলো সেই ঘরে। ঘুমন্ত সুমন্তবাবুর মাথার কাছেই একটা টেবিল। টেবিলে দু'টো ওষুধের শিশি, কয়েকটা ট্যাবলেট। ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল। সুদীপ যেন সম্মোহিত হয়ে রয়েছে। চোখের পলক পড়তে চাইছে না। সে তার হাতের সেই ছোট্ট শিশির ঢাকনা খুললো।

চোখ বুজে, চোয়াল শক্ত করে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা টিক টিক শব্দে সময়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো সুদীপ। বিষের শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা সে জলের গ্লাসে দিয়ে দিলো। যেমন ছিলো, গ্লাসটা তেমনভাবেই ঢেকে রাখলো।

ও জানে, রাতে উঠে সুমন্তবাবুকে জল খেতে হয়।

সকালে উঠে বিভাবতী দেবীই প্রথমে দেখেন, সুমন্ত বিশ্বাস আর বেঁচে নেই। তার নিথর দেহ পড়ে আছে বিছানায়।

সারা কোলিয়ারি এলাকায় এই খবর পৌছে গেল বেশ দ্রুতই। মাইনিংবাবু এবং বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা সুমন্ত বিশ্বাস গত রাতে হার্টফেল করে মারা গেছেন। গরিব-গুর্বো মজুর, লোডার, মুটিয়া, এমনকি অনেক কোলিয়ারি অফিসারও ছুটলেন

ধেমো কোয়ার্টারে। হাজার-হাজার কয়লাখনি-মানুষের বিষাদ আর স্বজন হারানোর যন্ত্রণা আছড়ে পড়লো ধেমো খনি এলাকায়।

সেই ভিড়ের মধ্যেই লেবার অফিসার বিলাসদেও সিং জিপ ছুটিয়ে এলো। সুমন্তবাবুর কোয়ার্টারে এসে তাঁর মৃতদেহটা অনেকক্ষণ ভালো করে দেখলো। বিভাবতীদেবীকে দু'চার কথা বলে সান্ত্বনা দিলো। ক্রন্দনরত সুদীপের দিকে তাকিয়েও দেখলো না। জিপ ছুটিয়ে নিজের অফিসে ফিরে গেল সে। নিজের টেবিলে বসেই সে টেলিফোন তুলে ডায়াল করল।

হ্যালো, পুলিস স্টেশন! হ্যালো, ওসি সাহেব আছেন নাকি? হ্যাঁ, রমনী ধর আছেন? আচ্ছা আচ্ছা।

কয়েক সেকেন্ড পরে ওপ্রান্তে গলার আওয়াজ পেয়ে বিলাসদেও কথা বলতে শুরু করলো।

রমনীবাবু! হাঁ, হামি ধেমো কোলিয়ারি সে লেবার অফিসার বিলাসদেও সিং। আপনি জানেন, সার্ভে অফিসার লেবার ইউনিয়নের লিডার সুমন্ত বিশওয়াস কাল রাত মারা গেছেন? লেকিন হামার মনে হচ্ছে এটা আনন্যাচারাল ডেথ। উনকো যো লেড়কা হ্যায়, সুদীপ বিশওয়াস। বহোৎ ডাউটেবল ইয়ংম্যান। আপ জরা ইসমে ধেয়ান দিজিয়ে। হাঁ হাঁ, ইসকে বারেমে হাম একঠো রিপোর্ট ভেজ দেতা থানেমে। হাঁ, হাঁ। সুদীপ বিশওয়াস কো হাম জানতা। আরে বাবা, হামার কাছে তো কুছ কুছ খবর আসে। ও লেড়কা আচ্ছা নেহি। আপ উও ডেডবডি পোস্টমর্টেম মে ভেজ দিজিয়ে।

খনি শ্রমিকরা শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করছিলো। ইউনিয়নের নেতারাও একে একে আসছেন। বেলা তিনটে নাগাদ ওসি রমনী ধর এক ঝাঁক পুলিস নিয়ে সেখানে হাজির। বললেন, ডেডবডি নিয়ে যাবো। থানায় একটা অভিযোগ গেছে। বলা হয়েছে, সুমন্তবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাই ডেডবডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।

এ যেন বিনা মেঘে বাজ পড়ার ঘটনা। সবাই হতবাক। ও সি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন। ইউনিয়ন লিডাররা বললেন, আপনি আইন অনুযায়ী চলবেন। ঠিক আছে।

ধেমো মেইন কোলিয়ারি অফিস থেকে বিলাসদেও সিং সেদিন বিকেলেই সাকতোরিয়ায় তার ওপরওয়ালাদের কাছে একটা ফ্যাক্স পাঠালো—'ইট ইজ দ্য কেস অব হোমিসাইড। পুলিস নাও ইনভেস্টিগেটিং .... ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব সুমন্ত বিশ্বাসের ছেলের চাকরির ব্যাপারে এখনই কোন প্রক্রিয়া শুরু করার দরকার নেই।

চারদিন বাদে সুদীপ খনি অফিসে বিলাসদেওয়ের কাছে গিয়েছিল। বাইরে ভজুয়া তাকে আটকায়। বলে, সাহেব তো হেড অফিসে গিয়েছেন সুদীপবাবু। তিন

হপ্তা পর ফিরবেন।

বলো কি!

হাঁ, এহি তো বাত হ্যায়।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ি ফিরলো সুদীপ। মা শোকে পাথর। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট কাল সকালে আসবে। সুদীপ ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিলো। সারা বাড়ি অন্ধকার। শুধু বিভাবতী দেবী এটা বিশ্বাস করে বসে আছেন, পোস্টমর্টেমে অবশ্যই তাঁর স্বামীর ন্যাচারাল ডেথের প্রমাণ মিলবে।

সুদীপের সামনে দিন আর রাতের কোন ফারাক নেই। বিলাসদেও কি তাকে ঠকাবে? সে বুঝে উঠতে পারে না। চাকরির জন্য কে তার হয়ে সুপারিশ করবে? কোথায় যাবে সে? মায়ের সামনে দাঁড়ানোর মুরোদ হারিয়ে ফেলেছে সে। মাঝে মাঝে ভাবছে সুদীপ, আমি একটা গবেট! কি করলাম আমি! বাবাই হয়তো ঠিক ছিলেন। তাঁর পরামর্শ শুনলেই ঠিক হতো। কিন্তু বিলাসদেও যে এত আন্তরিকতা দেখালেন! হয়তো তিনি কোন কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমার জন্য কিছু করবেন। ওর কথা তো আমি শুনেছি যা করতে বলেছিল, আমি তাই করেছি।

চার

পরের দিন সকালে বিলাসদেও সিংয়ের আসানসোলের বাসায় থানা থেকে টেলিফোন এলো।

হ্যালো!

হাঁ, বিলাসদেও বলছি।

আমি থানা থেকে রমনী ধর বলছি। ধেমোতে যাচ্ছেন না?

ক'দিন ছুটি নিলাম। বড়া স্ট্রেইন হয়ে যাচ্ছে। তা সেই কেসের খবর কি? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেলো?

সেই জন্যই তো ফোন করলাম। সুমন্ত বিশ্বাসের পেটে বিষ পাওয়া গেছে।

দেখলেন তো! হামার ঐসান ডাউট হচ্ছিলো। ওর লেড়কাকো পাকড়িয়ে লিন। ওকে দেখেই মনে হচ্ছিলো হামার, উও লেড়কা ইনবর্ন ক্রিমিনাল।

টেলিফোন ছেড়ে সে ফের তার ওপরওয়ালা বন্ধুকে টেলিফোন করলো।

আরে জগদীশ ভাই! শুনো, হামাকে কোরাপশন কেসে ফাঁসাতে চেয়েছিলো যে সুমন্ত বিশওয়াস, উও তো মরে গেলো। এবার হামার বিরুদ্ধে সাক্ষী কে দেবে ভাই! কাল সবেরে উসিকো লেড়কা ভি অ্যারেস্ট হো যায়েগা মার্ডার কেস মে। ফিন কেয়া হোগা? —বলে হো-হো করে অট্টহাসি হাসলো বিলাসদেও। ফের বললো, উনকো টোটাল ফ্যামিলি চৌপাট কর দিয়া ম্যায়। হা-হা-হা-হা!

পরদিন সকালেই থানা থেকে এক এস আই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে সুমন্ত বিশ্বাসের কোয়ার্টারে হাজির হলো। রিপোর্ট শুনে হতচকিত বিভাবতী দেবী।

এ কি করে হয়?

বাবাকে বিষ দিয়ে-খুন করার অভিযোগে আমরা আপনার ছেলে সুদীপ বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করছি।

এটা আপনারা করতে পারেন না! কি প্রমাণ আছে সুদীপের বিরুদ্ধে?— বিভাবতী দেবী চিৎকার করে উঠলেন।

দু'জন কনস্টেবল ততক্ষণে সুদীপকে ঘরের ভেতর থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এস আই ওদের নির্দেশ দিলেন, ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও।

বিভাবতী দেবী কেঁদে উঠলেন। চিৎকার করে উঠলেন, সুদীপ, বাবা, সত্যি করে বল, তুই কি কিছু করেছিস!

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সুদীপের মন। তার মাথা সামনের দিকে নুয়ে গেছে। তার চোখের সামনে সীমাহীন অন্ধকার। সে শুধউ নিজেকে এ কথায় শক্ত করে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমিই এই কাজ করেছি। বিলাসদেও সিংয়ের ফাঁদে আটকে গেছি আমি। আমি বোকা। এক্কেবারে বোকা। বাবাই ঠিক ছিলো। তিনি অনেক বড় মানুষ।

বিভাবতী দেবী অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন ঘরে। পাশের কোয়ার্টারের লোকজন ছুটে এসেছে। পুলিস জিপ সুদীপকে নিয়ে থানার পথে ছুটলো।

জিপ থেকে ধেমো খনির পিটমাউথ দেখা যাচ্ছিল। কোলিয়ারি চানকের হেডগিয়ারের চাকা ঘুরেই চলেছে। সেখানে গিয়ে কাজ করা তার আরে হলো না। শয়তানের চক্র যে কিভাবে জাল বিছিয়ে ছিল, এখন তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। আর কি! এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে!

গরম ভাতের স্বপ্ন

টুকরো টুকরো ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছিলো। তার সঙ্গে রহস্যময় কাঁপাকাঁপা আলো। কারা কথা বলে? ও আলোই বা কিসের?

দূরে আকাশকে ছুঁয়ে থাকা যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, তাব নিচেই আছে প্রগাঢ় অন্ধকার। পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অরণ্যানীতে সবুজের হাতছানি আছে। পাখির গান আছে। মহুয়ার গন্ধও আছে। অরণ্যছায়ায় দিনাবসানে তরঙ্গায়িত অন্ধকারও আছে। মৃদু বাতাস, অথবা তুফান যখন মাঝরাতে বনের বৃক্ষরাজির ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন যেন সেই অন্ধকারও ভয়ানকভাবে কেঁপে ওঠে, তরঙ্গ তোলে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে হতাশ্বাস শোনা যায়। হিস্‌হাস্—ফিস্‌ফাস্ শব্দ সারাক্ষণ অরণ্যরহস্যকে রাত্রি আঁধারের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। এসব রোজকার ঘটনা।

এখন তেমনই অন্ধকার। এটা রাজমহল জেলার পাহাড়ি এলাকা। এখানে-ওখানে কয়লাখনির পিট। কোথাও খোলামুখ খনি। কোথাও ইনক্লাইন বা সুড়ঙ্গ খাদ। রাজ্যটার নাম এখন ঝাড়খণ্ড। রাত বারোটার বেশিই বাজে এখন। হালকা ঝোড়ো বাতাস বইছিলো। তার সাঁ-সাঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। মালভূমির চড়াই-উৎরাই পথ। দূরে পাহাড়। অরণ্য আরো দূরে। এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় গ্রাম। আরো আরো পথ হাঁটলে বিহার-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত। চলতে চলতে হাজারিবাগ, গিরিডি, দুমকা এই সব শহর পাওয়া যাবে। যার আশেপাশে অজস্র আদিবাসী গ্রাম।

নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড। আদিবাসী সাঁওতালদের স্বপ্নের ভূমি। তাঁরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য চেয়েছিলো। তা তাঁরা পেয়েছে। স্বপ্ন এখন বাস্তবে। কিন্তু কেমন আছে লছু রায়, বুধন মাঝি, বিপাশা মাণ্ডি, জবা হরিজন, শিবলা মাহাতো, শেখ কুরবান আর মগন সোরেনরা? এই অসীম অন্ধকারের সঙ্গে এদের ভাগ্য আজ মিলেমিশে গেছে কি? নাহলে এত রাতে কেনই বা এমন রহস্যময় আলোর চলাফেরা? কেনই বা ফিস্‌ফাস্ কথা?

কেরোসিন-লম্ফের চার-পাঁচটি আলো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। বহুদূর থেকে মনে হচ্ছে, যেন কোনো অশরীরী কিছু, রাত গভীরে এই শুষ্ক পাহাড়ি পথ ধরে চলেছে কোথাও।

পাকা রাস্তা। এ রাস্তায় রাতে দৈবাৎ কখনো গাড়ি ঢোকে। যখন কয়লাখনিগুলো চালু ছিলো, তখন হরবখত ট্রাক চলতো। জিপ চলতো। খনির সাহেবদের অ্যাম্বাসাডরও চলতো। কিন্তু এখন রাতের শৈঃশব্দ্যের সঙ্গে পড়ে থাকা এই পথও গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। আকাশে চাঁদ নেই।

তবে একেবারে চুপচাপ নয় চরাচর। কিছু ফিস্‌ফাস্ কথা শোনা যাচ্ছেই। কেরোসিন-লম্ফের আঁকাবাকা আলোগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কণ্ঠস্বরও চলেছে যেন। সবটাই কেমন যেন ভৌতিক। ফিস্‌ফাস্-ফিস্‌ফাস্ কথা। কেমন এক মিশ্র ভাষা! এখানে অবশ্য বহু লোকই এই ভাষায় কথা বলে। কয়লাখনিতে কাজ করতে এখানে এসেছিলো বাঙালি, বিহারি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাগ্‌দি, বাউরি আরো কত লোক! লোকগুলো যেমন এই টুটাফাটা রুক্ষমাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তেমনি মিলেমিশে গেছে ওদের ভাষা।

কিন্তু ওরা কোথায় যাচ্ছে?

কাঁহা রে? বাবুলোগ কাঁহা ভৈল্?

আ যাবে। বাত তো পাক্কা থা।

বহোৎ পড়েসানি। কাঁহা কাম? হা ভগোয়ান!

ইয়া আল্লা! উও কেয়া? আদমী কা মাফিক! দেখো দেখো!

শেখ কুরবানের কথা শুনে সবাই চমকে তাকালো রাস্তা বরাবর সামনের দিকে। ওরা থামলো না। হাঁটতেই লাগলো।

একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আলো নেভানো। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মানুষ। তাগড়াই ষণ্ডা চেহারা। জিন্‌সের প্যান্ট, কালো গেঞ্জি, কোমরে বেল্ট।

লোক দু'টোর কাছে পৌঁছে গেছে ত্রিশ জনের এই দলটা। এর মধ্যে ছ'জন মহিলা! বাদবাকি পুরুষ।

আ গিয়া তুমলোগ?

হাঁ জী। আপনাকে টায়েম সে চলে আয়া হাম।

বহোৎ আচ্ছা। আভি তো কামকা বাত?

হাঁ জী। হামলোগোকা কাম চাহিয়ে। নেহি তো ভুখা মর যাতা থা। হামরা খাদান তো বন্‌ধ হো গিয়া সাহাব। ক্যায়সে চলু? কাঁহা মিলে-গা রোটি?

জিনস্-প্যান্ট দু'জন শিকারী চোখ দিয়ে ভালো করে এই দলটাকে দেখছিলো। অন্ধকারে সবাইকে কালো দেখায়। তবুও তো ওরা কালোই। ঠিকমতো এদের খাওয়া না জুটলেও এখনো পরিশ্রমী পাথরকোঁদা শরীর ভাঙেনি।

দু'জনই বুঝলো, খাটতে পারবে এরা। দু'জন পরস্পর আধা হিন্দি আধা বাংলায় কথা শুরু করলো।

কেয়া চৌধুরী, এহি লোগসে হোবে তো?

হোয়ে যাবে। এখোন টাইম কেতো হলো?

এগারো দশ।

ঠিক হ্যায়। কাম চালু হোবে রাত বারা বাজনে সে। পহেলা গ্রুপকো উঠা লুঙ্গা আভি।

আরে এ ভাই! তুমহারা সর্দার কওন?

ম্যায়নে।

কেয়া নাম?

শিবলা মাহাতো।

ঠিক হ্যায়, চলো।

রাতভর কাম হোগা। কও আওরত আয়া তুমলোগোকো সাথ?

ছও।

জিনস্-প্যান্ট একজনের নাম বাবিন চৌধুরী। আর একজন রমেশ শর্মা। বাবিন চৌধুরীর কথাতেই বাংলা টান। সে রমেশ শর্মাকে বললো, আওর লেট কোরে কী হোবে?

সহি বাত।—রমেশ শর্মা এবার এই দলটির সর্দারকে বললো, চলো শিবলা মাহাতো।

একটা বিরাট পাথুরে ঢিবির আড়ালে একটা ট্রাক দাঁড়িয়েছিলো। রমেশ শর্মা আর বাবিন চৌধুরী একটু এগিয়ে গিয়ে ট্রাকের সামনে দাঁড়ালো। ড্রাইভার কেবিনেই ছিলো। বাবিন চৌধুরী ড্রাইভারকে বললো, সোব সহিই আছে ধীরাজ।

ত্রিশ জন নারী-পুরুষ গাদাগাদি করে ট্রাকে উঠলো। ট্রাক ছেড়ে দিল। তার পেছন পেছন একটা জিপে বাবিন চৌধুরী আর রমেশ শর্মাও ছুটলো। রমেশ শর্মা গাড়ি চালাচ্ছিল।

দুই

এখন এসব জায়গা মরে গেছে। একে একে কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যারা খনিতে কাজ করতো, তারা অন্য কামধান্দায় এখান থেকে চলে গেছে। আর না খেয়ে, আটপেটা খেয়ে গ্রামগুলোতে পড়ে আছে দলিত আদিবাসী শ্রেণীর মুখ্যুসুখ্যু লোকগুলো। রমেশ শর্মা বাবিন চৌধুরীদের দরকার হয় এই লোকগুলোকেই। রাতের অন্ধকারেই ওদের সব কাজকর্ম চালাতে হয়।

ত্রিশ জন মানুষের দলটাকে নিয়ে একটা বন্ধ সুড়ঙ্গখনির পাশে এসে দাঁড়ালো সেই ট্রাক। এখান থেকে বসতি এলাকাগুলো দূরে দূরে মাঝখুমের মধ্যে নিথর জমে আছে। ঠিক এই জায়গাটাতেই কিছু লোকজনের চলাচলতি আর কথাবার্তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। যেন মৃতলোকে প্রাণস্পন্দন। কিন্তু কিসের প্রাণস্পন্দন? কাদেরই বা এই প্রাণস্পন্দন?

একটা বড় বটগাছ। তার নিচে এই মুহূর্তে খুব জমাট অন্ধকার নেই। সেখানে পাথর কয়লার একটা ঢিবি রয়েছে। তার পাশে একটা বাঁশের খাপরা-ছাওয়া ঘর। সেই খাপরা-ছাওয়া ঘরের ভেতর উনুনের আঁচে চারজন মহিলার টকটকে লালাভ মুখ দেখা যাচ্ছিল। ঘরের সামনে একটা বদখত চেহারার ঢ্যাঙা লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাবভঙ্গি তার খুনে ডাকাতদের মতো। এই মুহূর্তে লোকটা অবশ্য খুন অথবা ডাকাতি করার কথা ভাবছিলো না। বরং সে কিছু মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থার তদারকি করছিলো।

খাপরা-ছাওয়া ঘরে একটা বড় হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছিলো। আর একটা কয়লার উনুনে বিরাট কড়াইতে সবরকম সবজি দিয়ে তৈরি হচ্ছিলো একটা ঘ্যাঁট তরকারি। বদখত লোকটা রান্নার কাজকর্ম দেখাশোনা করছে। রান্না করছে চারজন আদিবাসী মহিলা। এই মরা জায়গাতে এভাবেই তৈরি হয়েছে প্রাণস্পন্দন। এই ঘরের সামনেই রমেশ শর্মা তাদের জিপটাকে এনে দাঁড় করালো। বাবিন চৌধুরী লাফ দিয়ে জিপ থেকে নেমে বদখত চেহারার লোকটাকে বললো, কেয়া রে উমেশ! খানা রেডি?

হাঁ, রেডি।

ঠিক হ্যায়। দুসরা গ্রুপ চলা আয়া। পহেলা গ্রুপকো আভি উপ্‌পর ওয়াপস কর লেতা।

উমেশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। ত্রিশ জনের সেই দলটা ট্রাক থেকে নেমে পড়েছে। বাবিন চৌধুরী আর দেরি না করে সেখানে গেল। রমেশ শর্মা ছিলো সেখানে। বাবিন চৌধুরী তাকে বললো, সে খনির সেকেন্ড আউটলেটে যাচ্ছে। এখন যারা খনির ভেতর কাজ করছে, তাদের সে তুলে নিয়ে আসছে। রমেশ

শর্মা বললো, ঠিক হ্যায়। হাম ইস তরফ দেখতা হুঁ।

বাবিন চৌধুরী জিপ স্টার্ট দিয়ে সোজা চলে গেল এই বন্ধ ইনক্লাইন খনির সেকেন্ড আউটলেট অর্থাৎ দ্বিতীয় মুখের দিকে।

আধ কিলোমিটার রাস্তা জিপ ছুটিয়ে বাবিন চৌধুরী যেখানে এসে থামলো, সেখানে জোর কাজ চলছে। চারটে বড় বড় ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটা ট্রাক পুরো ভর্তি। আর-একটা ট্রাকেও কয়লা তোলার কাজ চলছে। বন্ধ ইনক্লাইন খনির দ্বিতীয় বহির্পথ দিয়ে একের পর এক আদিবাসী মজুর মাথায় করে কয়লার টব এনে সেই কয়লা ঢেলে দিচ্ছে ট্রাকের ওপর। দ্বিতীয় ট্রাকটাও উপুর উপুর ভর্তি করা হচ্ছে। কেরোসিনের মগবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় সেই কালো কালো মানুষগুলোকে আদিম মানব বলে মনে হচ্ছিলো। অথবা যেন কোন প্রেতপুরী থেকে উঠে আসা কতগুলো অশরীরী বুভুক্ষু আত্মা।

চৌধুরী কয়লা-ভর্তি ট্রাকের কাছে গিয়ে হাঁক দিলো—

সিংজী, গাড়ি ছোড় দিজিয়ে।

স্টার্ট পেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দে গর্জন করে উঠলো অতবড় ভারী ট্রাকের ইঞ্জিন। কয়েক মিনিটের মধ্যে মালভূমির উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা রাস্তায় হারিয়ে গেল সেটা। এবার খনিমুখে এলো চৌধুরী। ফের চিৎকার করে বললো—আরে এ আদমী লোগ! উঠ যাও আভি! তুমহারা কাম খতম।

যে লোকগুলো খনির ভেতর থেকে কয়লা কেটে এনে লরিতে তুলছিলো, ওরা এ কথায় প্রথমে থমকে গেলেও কাজ বন্ধ করলো না। বরং এ-কথায় ওরা একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। চৌধুরী এবার জোরসে ধমক লাগালো—আরে এ হারামি কা বাচ্চা! মেরা বাত শুনতা নেহি কেয়া?

এই মুহূর্তে যে দুটো মজুর ট্রাকের কাছে কয়লার টব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরকে চৌধুরী বললো, ঠার যাও ইহাঁ! অ্যাই বাঞ্চোৎ!

মজুর-দু'টো ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চৌধুরী হুঙ্কার দিয়ে বললো, তুমহারা সর্দারকো বুলাও!

জী সাহাব!

সেই মুহূর্তেই মজুর দলের সর্দার এসে চৌধুরীর সামনে দাঁড়ালো।

তুমহারা আদমীলোগকো খাদানসে ওয়াপাস কর লো।

অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে গেলে ইনক্লাইনের ভেতর থেকে মজুররা হাতে কেরোসিনের মগবাতি নিয়ে ওপরে উঠে আসছিলো। মোট বারোজনের দল। সর্দারের নির্দেশে ওরা মগবাতিগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখলো। চৌধুরী সর্দারকে বললো, সুধন, ব্যস, চলো! তুমলোগোকা খানা রেডি হো গিয়া।

বারোটি আদিবাসী মজুরের বারো জোড়া চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো খাবারের

কথায়। এক থালা ভাত—ওদের কাছে আজ স্বর্গের চেয়েও বেশি। ওরা বিকেল চারটেয় খাদানে নেমেছিলো একগ্লাস করে তেজপাতা দেওয়া চা আর হাফ পাউন্ড পাউরুটি খেয়ে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে এই রাত বারোটাতেও ওদের শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। সেই ঘামের রঙ কালো। ওদের কালো শরীরে কয়লার গুঁড়োর কালো রঙ। এই কালো রাতে অন্ধকারের কালো ওদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বারোখানা মগবাতির ভাঙাচোরা আলোয় ওদের ক্ষুধার্ত মুখগুলো কালিমালিপ্ত অন্ধকারেরই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছিলো।

কয়লাভর্তি দ্বিতীয় ট্রাকটাও গোঁ গোঁ শব্দ তুলে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো। আরো দু'টো খালি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। চৌধুরী তর্জনী তুলে একটা ট্রাকের দিকে নির্দেশ করে বললো, ওহি পর চঢ় যাও! চলো, চাওল মিলেগা তুমকো।

ভাতের কথা শুনে ওরা ছুট লাগালো সেই ট্রাকের দিকে। পড়িমড়ি করে ট্রাকে উঠে পড়লো কালো কালো লোকগুলো। ট্রাক ছেড়ে দিলো। তার পেছন পেছন চললো বাবিন চৌধুরীর জিপ। খাদানের সামনে পড়ে রইলো কয়লা তোলার টবগুলো। আর কেরোসিনের মগবাতিগুলোও সেখানে জ্বলতেই থাকলো। সামান্য হাওয়ায় সেই আলোগুলো এঁকে বেঁকে ফণা তুলছিলো।

এক ডজন ক্ষুধার্ত মানুষকে শুধু একথালা ভাত খাইয়ে বন্ধ খনি থেকে টন টন কয়লা বে-আইনিভাবে তুলে নিয়ে গেল রমেশ শর্মা, বাবিন চৌধুরী আর উমেশ ঝা-র সাঙ্গোপাঙ্গোরা। এই এলাকার ত্রাস এইসব কোল-মাফিয়া গ্রুপ। এদের বে-আইনি কয়লা তোলা এবং পাচার চলে রাতভর।

তিন

এই অঞ্চলের মস্তান উমেশ ঝা-র সেই বাঁশ ও খাপরা-ছাওয়া ঘরে একটা কাঠের বাক্সের ওপর রয়েছে কয়েক বস্তা মোটা চাল। এক টিন সর্ষের তেল। আর ছোট ছোট পোঁটলায় নুন, ডাল, মশলাপাতি ইত্যাদি। একটা বিশাল ড্রামে রয়েছে খাবার জল। সেই জল কতটা পান করার যোগ্য তা বলা মুশকিল। রয়েছে কয়েক বণ্ডিল শালপাতার থালা, গোটা ত্রিশেক স্টিলের গ্লাস, হাতা, খুন্তি, চামচ ইত্যাদি কিছু জিনিসপত্র।

বারো জনের দলটাকে নিয়ে সেই ট্রাক বাঁশ-খাপরার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। পেছন পেছন বাবিন চৌধুরীর জিপ। বাবিন চৌধুরীর তাড়া খেয়ে লোকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামলো। ঘরের সামনে চত্বরে এসে উমেশ ঝা চেঁচালো— বৈঠ যা হিঁয়াপর!

ঝপাঝপ বসে পড়লো লোকগুলো। একেবারে মাটিতেই। যে চারজন মহিলা

ভেতরে রান্না করছিলো তারাই বারোজনের সামনে পটাপট শালপাতার থালা পেতে দিলো। তারপরই ধোঁয়া ওঠা মোটা চালের ভাত। সঙ্গে সঙ্গেই পাতে পড়লো তেমনি গরম ঘ্যাঁট তরকারি।

বাবিন চৌধুরী, রমেশ শর্মা আর উমেশ ঝা দেখছিল তাদের খাওয়া। তিনজনের চোখমুখ উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইছে। রমেশ শর্মা তার মনের বিকৃত উল্লাস চাপা দিতে পারলো না। বলে উঠলো—খা লো, আচ্ছা সে খা লো। যিতনা চাহে। আরে এ মুন্নিবাঈ, না চুন্নিবাঈ! তেরে কো মরদ কো আচ্ছা সে চাওল দো, সবজি দো। যিতনা মাঙে, উতনা হি দো।

বারোজন লোক গোগ্রাসে ভাত তরকারি গিলছিলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যতটা ভাত খেয়ে নেওয়া যায়। বড় বড় জিভ বের করে কালো লোকগুলো মুঠো মুঠো ভাত ঢুকিয়ে নিচ্ছিলো পেটের ভেতর।

তাই দেখে বাবিন চৌধুরী হো-হো করে হেসে উঠলো। পাশে দাঁড়ানো উমেশকে বললো, শালে লোগ একদম কুত্তা কা মাফিক খা রহা।

জানবর তো এহি-ই হ্যায়। বললো রমেশ শর্মা।

সহি বোলা তু নে।

এবার হঠাৎ ধমকে উঠলো রমেশ শর্মা—আরে এ মুন্নিবাঈ, না চুন্নিবাঈ! তু লোগ ভি জলদি খা লে। নেহি তো বহোৎ লেট হো যায়েগা!

সেই চার শীর্ণকায়া মহিলা ছেঁড়া নোংরা শাড়িতে যতটা সম্ভব শরীর ঢেকে বড় করে ঘোমটায় নিজেদের আড়াল করে খেতে বসলো।

এ দিকে চলছিলো আরো এক রূঢ় কাহিনী।

বটগাটের নিচেই পাথুরে মাটিতে বসে আছে আগের সেই ছ'জন মহিলা এবং আরো চব্বিশ জন বুভুক্ষু মানুষ। যাদের সর্দার শিবলা মাহাতো। ওদেরকে দু'বান্ডিল বিড়ি দেওয়া হয়েছে। আর একখানা দেশলাই। গাছের নিচে অন্ধকারে চব্বিশটা বিড়ির আগুন জ্বলতে-থাকা ধূপকাঠির মতো লাগছিলো।

শুধু কি তাই? বারো জনের দলটার কাছ থেকে সরে গিয়ে উমেশ ঝা চলে গেল এখন শিবলা, বুধন, জবা, শেখ কুরবান, মগন সোরেনদের কাছে। যারা গরম গরম ভাত খাচ্ছিলো, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ওদের বললো, উসি লোগোকা মাফিক চাওল মিলেগা তুমকো ভি। চায়ে-পাঁওরোটি খানা হো গিয়া?

হাঁ জী।—শিবলা বললো।

যারা ভাত খাচ্ছিলো, এই মুহূর্তে তারা ভাগ্যবান। ত্রিশ জনের এই দলের বেশিরভাগ লোকই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভাত খানেওয়ালাদের দিকে। শুধুমাত্র শিবলা মাহাতোর মতো দু'একজন সমঝদার মানুষ, আর বিপাশা, জবা,

পিয়ারী, বিন্দিয়ার মতো মেয়েরা উদাসীন চোখে উমেশ ঝা-র কথার সারমর্ম বুঝবার চেষ্টা করছিলো।

হাঁ, হাঁ। চাওল তুমকো ভি মিলেগা। কও আওরত তুমহারা?

উমেশের এই প্রশ্নের উত্তরে শিবলা মাহাতো বললো, ছও।

ঠিক হ্যায়। আওরর্তলোগ খানা পাকায়েগা। তুমলোগ চলো খাদান। তিনো ট্রাক ভর্তি কোয়লা কাটনে হোগা। তুমহারা ভি মিলেগা যাদা সে যাদা চাওল। পেট ভরকে খায়েগা। কোই বাত নেহি।

ওদের মধ্যে ছ'জন মহিলা এবার ঢুকলো খাপরার সেই ঘরে। ওরা এবার রান্না করবে।

চব্বিশজন মজুরকে নিয়ে একটা ট্রাক ফের চললো খাদান।

আরো একটি দৃশ্যেরও যবনিকা হলো। ভাত খাওয়া হয়ে গেলে সেই বারো জন মজুর আর তাদের চারজন মহিলা, মোট ষোলজনের হাতে দেওয়া হলো পাঁচটা করে টাকা।

ব্যস! রমেশ শর্মা, বাবিন চৌধুরীদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক শেষ। পেট পুরে মোটা চালের ভাত খেয়ে, হাতে পাঁচটা করে টাকা নিয়ে সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রমের ভারে ক্লান্ত, ঝিমিয়ে পড়া ষোলোটি নারী-পুরুষ চলতে শুরু করলো বিহার সীমান্তের দিকে। যেখানে ওদের গ্রাম। যেখানে দিবারাত্র হাহাকার। পেট-ভাতের বিনিময়ে ওরা লক্ষ টাকার কয়লা তুলে দিলো বন্ধ খনি থেকে। যে টাকায় রমেশ শর্মাদের মতো কয়লা মাফিয়াদের পকেট উপছে উঠবে। পকেটে পকেটে ঘুরবে রিভলবার-ছুরি-ছোরা। নিস্তব্ধ এই অন্ধকারের বুকে কেরোসিন লম্ফের আলো হাতে নিয়ে চলেছে ষোলো জনের সেই দল। ওদের যাত্রা শুধুই শূন্যতার দিকে। যেখানে বেঁচে থাকাও যা, মৃত্যুও বোধহয় তেমনই। যে পথ দিশাহীন, অন্তহীন, আবার তা কোনো পথই নয়।

চার

ইনক্লাইন মাইন। সুড়ঙ্গ খনি। এখানে লিফ্‌টে করে নামতে হয় না। খনিমুখ থেকে ঢালু পথ ধরে নামতে হয়। এই খনি বন্ধ করে দিয়েছে ই সি এল, অর্থাৎ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড। কিন্তু এখান থেকে কয়লা কাটা বন্ধ হয়নি। নিয়মকানুনের তোয়াক্কা নেই। বেপরোয়া কোল মাফিয়ারা এইভাবেই গরিবগুর্বো মানুষকে চাট্টি ভাতের লোভ দেখিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া খনিগর্ভে। বলতে গেলে বিনা খরচায় লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লা তুলে ট্রাক ভর্তি করে পাচার করে দিচ্ছে। আর খিদের তাড়নায় বিড়ম্বিত সেই মানুষগুলো? তারা কী করছে?

কেরোসিনের মগবাতি নিয়ে ভয়ঙ্কর অন্ধকার সেই খনিগর্ভে নেমেছে শিবলা মাহাতোর দলবল। ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা ট্রাক। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ভরে উঠছে এক একটা ট্রাক। অন্ধকার গভীরতর হচ্ছে। দূরান্ত থেকে নিশাচর পাখির ডাক ভেসে আসছে।

এখান থেকে সামান্য দূরে খনি-কোম্পানিরই পুরনো একটা ভাঙা ঘরে বসে আছে রমেশ শর্মা আর চৌধুরী। বেশ বড় পাকা দালান এটা। খনি বন্ধ হয়ে গেছে। এই দালানের দরজা জানালা সব খুলে নিয়ে চলে গেছে বদমাইশরা।

এই দালান একসময় খনির অফিসবাড়ি ছিলো। এখন তা দিনের বেলা খাঁ খাঁ করে। রাতে মজলিশ বসে বদমাইশ মাফিয়া গুণ্ডাদের। চৌধুরী আর শর্মা বোতল খুলে হুইস্কির পেগ নিয়ে বসেছে। আর মজাসে হিসেব করছে ওদের নাফা কিরকম হচ্ছে। ঘরের মধ্যে একশো ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বলছে। এখানে কোনো অন্ধকার নেই। শর্মা বললো, আজ পাঁচ ট্রাক হো যায়ে তো বহোৎ অ্যাডভান্স রহেগা হামারা কাম।

হুইস্কি চড়িয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিলো চৌধুরী। শর্মার কথা শুনে চোখ খুলে বললো, হাঁ, সব ঠিকই হ্যায়। লেকিন পত্রকারলোগ যাদা লিখতে হ্যায় হামারে বারেমে।

হাঁ, হাঁ! রূপা-চাঁদি ঘুসা দুঙ্গা উসিকো পাকিটমে। সভি লিখনেওয়ালা চুপ হো যায়েগা।

চৌধুরী হাসলো এই কথায়। বোতল খুলে মদ ঢাললো গ্লাসে।

তক্ষুনি একটা মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, অন্ধকারের মধ্যে সোজা রাস্তা ধরে মোটর সাইকেলের হেডলাইটের আলো।

দালানের সামনে এসে থামলো মোটর সাইকেল। রমেশ শর্মা বাইরে এলো। দেখতে পেলো সূরজ সিংকে। শর্মাদেরই লোক। কোমরে রিভলবার নিয়ে মোটর বাইক করে এরা এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। গরম দেখিয়ে সকলের মুখ বন্ধ রাখে। শর্মারা এদের প্রচুর টাকা দিয়ে পোষে। দরকারে কাউকে খুন করতে এরা দ্বিধা করে না।

কেয়া সূরজ? কোই খবর হ্যাঁয়?

নাহি বস, সব ঠিক হ্যায়। লেকিন থানে কো যো নয়া সাব-ইনেস্পেক্টর আয়া থা না?

তো কেয়া হুয়া?

আপকো ঢুঁন্ডতা থা।

হাঁ, হাঁ। জানতা হুঁ ম্যায়নে। রূপেয়া চাহিয়ে উসিকো। করেঙ্গে হাম বাতচিৎ। তুম এক কাম করো সূরজ।

কেয়া সাব?

খাদানকো পাস যাকে উহা ঠার যাও। উহা আভি হামারা কোই লোক নেহি হ্যায়।

ঠিক হ্যায় সাব।

সূরজ সিং বাইক হাঁকিয়ে চলে গেল।

সেই ঘরে বসে চৌধুরী আর শর্মা ছকতে লাগলো আগামী পরিকল্পনা। রমেশ শর্মা রাগত স্বরে বললো, পোলিসবালোকে হেলনা দোলনা যাদা বাঢ় গয়া।

নেক্সট ইলেকশনমে উম্মিদবার হোনা চাহিয়ে হামকো। যব হাম পলিটিক্সমে ঘুস যায়েগা, তব হি ঠাণ্ডা হো যায়েগা হারামজাদে পোলিসলোগ।—বললো চৌধুরী।

ওরা যখন এসব কথা বলছিলো, তখনই খাদানের দিকে ধড়াস-ধড়াস শব্দ শোনা গেল। দু'জনেই মদের ঘোরে ছিলো। শব্দটা দু'জনের কানে গেলেও তা ওরা খেয়ালও করলো না।

অন্ধকার রাত্রির সমস্ত দিক চুপচাপ। তার মধ্যে ওই দু'তিনবার ধড়াস ধড়াস শব্দ হয়েই ফের নিস্তব্ধ সবকিছু। রমেশ শর্মা আর বাবিন চৌধুরী বসে বসে হিসেব করছিলো আগামী ভোটে কোন্ দলের হয়ে দাঁড়ালে সবচেয়ে বেশি সুবিধা মিলবে।

ঠিক সেই সময় অন্ধকার কাঁপিয়ে দিয়ে ছুটে এলো সূরজ সিংয়ের মোটরবাইক। দ্রুত ঘরে ঢুকলো সূরজ। উদভ্রান্ত সে। চৌধুরী জিজ্ঞেস করলো, কেয়া হুয়া?

হাঁফাচ্ছিল সূরজ। বললো, মালিক—উও ইনক্লাইন খাদানকা মুহ্ ধস গয়া জী। উ লোক সব খাদান কো অন্দর মে রহ্ গয়া!

একদম বন্ধ?

হাঁ জী।

কোই টুটা-ফাটা রাস্তা নেহি হ্যায়?

নেহি জী।

চটকে গেছে দু'জনের নেশা। সূরজের মোটর বাইকের পেছনে বসে ওরা ছুটলো খনির দিকে। পৌঁছে গেল দেড় মিনিটের মধ্যে।

তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। একটা ট্রাক প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে কয়লায়। আর দু'টো ফাঁকা। দু'টো মগবাতি জ্বলছে বাইরে। শিবলা মাহাতোদের চব্বিশ জনের পুরো দলের একজনও বাইরে নেই। ইনক্লাইন খনির মুখ ধসে একদম বসে গেছে। মাটি নেমে গেছে অনেক নিচে। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটিতে কান পাতলো বাবিন চৌধুরী। দেখাদেখি সুরজ। কোনো মানুষের প্রাণের শব্দ নেই।

বাবিন চৌধুরী জলের শব্দ পেলো। বললো, পানী গিরতা রহা।

সূরজও সেই শব্দ পেয়েছে। বললো, হাঁ জী। পানী বহতা হ্যায় অন্দরমে।

রমেশ শর্মা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। ট্রাকগুলোর কাছে গিয়ে সে ড্রাইভারকে

নির্দেশ দিলো। তুমলোগ আভি হিঁয়াসে চলা যাও! জলদি! ধস্ হো গিয়া খাদানমে। বাতচিত বাদ মে হোগা।

সূরজ সিংয়ের মোটর বাইকে করে দুজনে চলে এলো উমেশ ঝা-র এখানে। যেখানে খাপরা-ছাওয়া ঘরে রান্নাবান্না হচ্ছিলো। উমেশ দাঁড়িয়ে ছিলো কাছেই। ওকে ডেকে নিয়ে কথা বললো চৌধুরী আর শর্মা। এরপরই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেল। চারজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি বেড়ে গেল। জিপটা রাখা ছিলো বটগাছের পেছনে, আড়ালে। সেটাকে স্টার্ট করে এগিয়ে নিয়ে এলো বাবিন চৌধুরী।

সূরজ আর উমেশ ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে। ওখানে এখন নিশ্চিন্তমনে রান্না করছিলো শিবলার বৌ পিয়ারী মাহাতো, মগনের বৌ বিন্দিয়া সোরেন, বুধনের বৌ জবা হরিজন, বিপাশা মান্ডি, লতা মুর্মু, শান্তি মুর্মুরা।

উমেশ ঘরে ঢুকেই বললো, আভি খানা পাকানা বন্ধ করো।

জবা হরিজন তেজি মেয়ে। সে জিজ্ঞাসা করলো, কিঁউ?

অন্য সময় কোন হরিজনের বৌ এমন প্রশ্ন তুললে এরা তাকে দাবড়ে দিতো। কিন্তু এখন কিছু বললো না উমেশ। শুধু ঠাণ্ডা স্বরে বললো, পুলিস আ গিয়া খাদানমে। আভি হাম ভাগ যাঁউ।

একটা কাঠের বাক্স থেকে দশ-বারোটা পাঁউরুটি বের করে সে বউগুলোকে বললো, লে লো জলদি।

আরো দু'একটা প্যাকেটে চা-চিনি যা ছিলো সেগুলো বের করে উমেশ জবাদের বললো, বাঁট কে লে লো। হতভম্ব ওরা তাই করলো।

চৌধুরী জিপটাকে রাস্তার ওপরই এনে রেখেছিলো। উমেশ প্রায় কুকুর তাড়ানোর মতো তাড়িয়ে এনে মেয়েগুলোকে জিপে তুললো। বাবিন চৌধুরী জিপ স্টার্ট দিলো। জিপ ছুটলো জামতাড়া রেল স্টেশনের দিকে। পেছন পেছন সূরজ সিংয়ের মোটর বাইক।

জিপে বসে ত্রস্ত-বিহ্বল বিন্দিয়া পিয়ারী-জবারা ভাবছিলো হাঁড়িতে ফুটতে থাকা গরম ভাতের কথা। আর ওদের মরদরা? ওদের কী হবে? ওরা কোথায়?

পাঁচ

পাটনার দিকে যাবার ট্রেন আছে ভোর সাড়ে-চারটেয়। চৌধুরীর ভালোই হলো। বৌ-গুলোকে ওদের গ্রামের কাছাকাছি একটা স্টেশনের টিকিট কেটে দিলো। ওদের ছ'জনের হাতে ধরিয়ে দিলো চল্লিশটা করে টাকা। রমেশ শর্মা ওদের বোঝালো, পুলিস এসে গেছে। তাই ওদের মরদরা খাদানের ভেতর লুকিয়ে আছে। পুলিস চলে গেলেই মরদরা উঠে আসবে। কোনো চিন্তা নেই।

বিন্দিয়া-পিয়ারীদের মন মানতে চায় না। কোথায় গেল ওদের মরদরা? কাঁহা ভৈল হামারা মরদ!

বউ-গুলোর কোনো কথা শুনলেই না রমেশ শর্মা। চোখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরী আর সবুজ সিং।

ট্রেন প্লাটফর্মে থামামাত্রই ঠেলে জোর করে ছ'টি বউকে ওরা ট্রেনে তুলে দিলো। ট্রেন ছাড়লো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো জবা-বিন্দিয়ারা। ওদের মরদরা পড়ে রইলো কোথায়?

ট্রাকগুলো চলে গেছে। বাদবাকি প্রমাণ লোপ করতে সমস্ত জিনিসপত্র শর্মারা তুলে নিলো জিপে। এখন ভোর সাড়ে-পাঁচটা বাজে। বাবিন চৌধুরি বললো, আভি হামলোগ আপনা আপনা ঘর চলা যাউঁ। এক মহিনা বাদ ফির মিলেঙ্গে দেওঘর কা ডেরাপর। ঠিক হ্যায়?

হ্যাঁ, সব ঠিকই আছে। অপরাধীরা এখানে সব এককাট্টা।

রাজমহলে সেই অন্ধকার খনি সুড়ঙ্গে অক্সিজেনের অভাবে এতক্ষণে ঢলে পড়েছে সেই চল্লিশজন আদিবাসী মজুর। এই জন্মে ওদের আর ভাত খাওয়া হলো না।

আর ভাতের আকাঙ্ক্ষা রইলো না ওদের। এভাবে পশুর মতো বেঁচে থাকতে হবে না আর। পরম শান্তিতে অন্ধকার কালো সুড়ঙ্গের ভেতর কঠিন কালো কয়লার ওপর দমবন্ধ হয়ে এখন ওরা শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওই চিরনিদ্রিত মানুষগুলোর খোঁজ পাবে না আর কেউ। শর্মা-চৌধুরীদের দলবল এঁদের কথা খুব দ্রুত ভুলে যাবে।

লক্ষ লক্ষ বছর পরে এই ভুখা মানুষগুলো মাটির গভীরে কয়লার সঙ্গে মিশে গিয়ে জৈবশিলায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

অন্ধকারের দিকে

তাগড়াই চেহারা ফেকলুরামে। সরবতিয়া নুনিয়া হচ্ছে ফেকলুরামের বউ। ওদের বাড়ি হলো বিহারের বালিয়া জেলার ভোগপুর গ্রামে। এ আজকের কথা নয়। ষাট সালের কথা। সকালে ফেকলুরাম খেতিতে যাচ্ছিল দিনমজুরির কাজে। সরবতিয়াও যায় ওর মরদের সঙ্গে। কিন্তু ক'দিন ধরেই সে গাঁইগুঁই করছে। খেতিতে যাবে না। আজ সে একেবারে বেঁকে বসেছে। কিছুতেই যাবে না কাজে। কেন?

দারুণ চেহারা সরবতিয়ার। একেবারে টান টান চাবুকের মতো। বউকে নিয়ে একেবারে পাগল ফেকলু। বউ গোঁ ধরে থাকায় ফেকলু মুশকিলে পড়লো। কেয়া রে? কেয়া ভইল? কিঁউ না যাই?

হিঁয়া পর না রহি হাম।

কিঁউ?

সরবতিয়া স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবেগ ঢেলে দিয়ে বলে—

চলো না কোলওয়ারি। উঁহা কাম করোগে। রুপাইয়া আচ্ছা মিলেগা। বাজা (রেড়িয়ো) খরিদে গা। গানা হোগা।

ক'দিন ধরেই এভাবে ফেকলুরামকে বিব্রত করে তুলছে সরবতিয়া।

এ-সবের কারণ আছে। ভোগপুরের মতো অজ গ্রামে সরবতিয়ার মন টিকবে

কেন? ওর জন্ম বাংলায়। ওর বাবা আসানসোলের কাছে শালতোড় কয়লাখনিতে লোডারের কাজ করতো। সেই শালতোড়ের শ্রমিক ধাওড়াতেই মা মুনকি নুনিয়ার গর্ভে সরবতিয়ার জন্ম হয়েছিলো। সতেরোটি বছর সে কাটিয়েছে বাংলায়। টাউন এলাকায়। বিয়ে হয়ে এই পোড়া দেশে খেতিতে দিনমজুরি! আরে ছ্যা!

সরবতিয়ার মনটা সব সময় বিরক্তিতে ভরে থাকে।

পাঁচ পাঁচ বরষ হো গৈল ভোগপুরমে! ব্যস! আওর না রহে হম!

জেদ তো জেদ। সুন্দরী বউয়ের সে জেদ আর ভাঙতে পারলো না ফেকলুরাম নুনিয়া।

শেষ পর্যন্ত একদিন ট্রেনে চেপে সরবতিয়া আর ফেকলুরাম আসানসোল স্টেশনে এসে নামলো। সেখান থেকে শালতোড়।

সরবতিয়ার বাবা মারা গেছে বছর তিনেক আগে।

উনিশ শো আটান্ন সাল। কয়লা খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়নি তখন। শ্রমিকদের খুব দুর্দশা। তবু খনি মালিক সরবতিয়ার মা মুনকি নুনিয়াকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়েছিলো। তাই নিয়ে মুনকি ফিরে যায় দেশে-গাঁয়ে।

কাজেই শালতোড় এসে সরবতিয়ারা প্রথমে একটু হকচকিয়ে হয়ে গেল। তবে সে দমবার পাত্র নয়। এ-ধাওড়া সে ধাওড়া খুঁজে সে পরিচিত লোক জোগাড় করে ফেললো ঠিক। সতেরো বছর বাংলায় কাটিয়েছে সে। হোক না হিন্দুস্তানী টান, তবু বাংলাটা সে বোঝেও ভাল, বলেও সে রকম।

জুরান চাচা। হামি সরবতিয়া। হামার বাপ শত্রুঘন নুনিয়া শালতোড় কোলওয়ারির লোডার ছিল্য। চিনতে পারলো?

আরে সরবতিয়া বেটি! কুথ্যা থিকে আঁইলি, হাঁ?

শ্বশুরাল ঘর ভোগপুর। জিলা বালিয়া। মরদ কো কাজ-কাম নাহি বা। কাজের লেঁইগ্যে চইলে এইলম।

আচ্ছা আচ্ছা।

জুরান তিরকে, ভোজু বিশ্বাস, দিলারা বেগম, জয়রাম পাণ্ডে, যদুনাথ রাজোয়ার, পিতাম্বর মারাণ্ডি,হামিদা কাজি এমন অনেক বয়স্কারাই সরবতিয়াকে চিনতে পারল। সবাই উচ্ছ্বসিত। তাদের ধাওড়ার মেয়ে সরবতিয়া। তার মরদ তো ওদের জামাই। সত্যি, জামাই আদরই পেল ফেকলুরাম। এ ধাওড়া এ ধাওড়ায় নেমতন্ন চললো কয়েকদিন ধরে। নাচা হলো। গানা ভি হলো—

'জামাই এলো কামাই করে
মুরগী খাবার আশে
কচুর ঝোল দেখে জামাই
খিলখিলিয়ে হাসে।

জামাই এলো কামাই করে,
খেতে দিব কি?
হাত বাড়িয়ে দাও গামছা
মুড়কি বেঁধে দি।'

কিন্তু এ জামাই কামাই করে আসেনি। কামাই করতে এসেছে। তাই কাজের কথায় আসতেই হলো।

কয়লা খাদানে কাজ করবে তার মরদ। আর এমনই রঙচঙে দিন কাটাবে সরবতিয়া। এমনই যে ইচ্ছে তার! ওই ভোগপুর গ্রাম! আর ওই খেতিজমির মুটিয়া দিনমজুরের কাজ! ভাবলেই গা শিরশির করে ওঠে সরবতিয়ার। কান্না পায়। ফিলিম্ মে ক্যায়সা গানা-বাজানা হোতা। হিরো-হিরোইনকো ক্যায়সা ড্যান্স! অ্যায়সা তো হামকো ভি চাহিয়ে! এবার সে ধরলো মাইনিং সর্দার রমেশ মাঝিকে।

আরে হেঁই বাবু! কাম তো চাহিয়ে হামার মরদ কো!

হুঁ, হুঁ।

তো ক্যায়সা মিলেগা?

শালতোড় খাদানের মালিক দৌলতরাম আগরওয়ালার কাছে চইল্যে যা। বুলবি, তু শত্রুঘন নুনিয়ার বিটি আছিস বটে। তুহার মরদের লৈইগ্যে কাম মাঙবি।

রমেশ মাঝিকে নিয়েই একদিন ফেকলুরাম আর সরবতিয়া শালতোড় কয়লা খাদানের মালিক দৌলতরাম আগরওয়ালার অফিসঘরে ঢুকে পড়লো।

শত্রুঘন নুনিয়াকে ভালোই মনে আছে দৌলতরামের। সে দু'জনকেই দেখছিলো। মরদের বাচ্চা মরদ ফেকলুরাম, আর আগুনের ডেলা সরবতিয়াকে। দু'জনেই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

বোলো, কেয়া মাংতা?

কাম, হুজুর।

বেশ ভালো করে ফেকলুরামের মজবুত শরীরটা দেখে নিলো দৌলতরাম।

আরে, তুম তো যাদা পহলবান হো। খুন খারাপি কুছ কিয়া থা কভি? হামরা ঐসান আদমী চাহিয়ে।

এ-কথায় হকচকিয়ে গেল সে।

হোজৌর মা-বাপ! ম্যায় নে তো কভি—

মার দাঙ্গা বহোৎ কিয়া মেরে মরদনে।—ফেকলুকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললো সরবতিয়া।

হাঁ, হাঁ। ঐসান লাগতা। আগরওয়ালার চোখ এবার সরবতিয়ার দিকে। সরবতিয়ার মুখ থেকে বুকে এসে আটকে যায় খনি মালিকের দৃষ্টি। সেই মুহূর্তে আগরওয়ালা মনে মনে অনেক কিছু ভেবে ফেললো।

সরবতিয়া মরীয়া। সে ফের বললো, হামরা মরদনে আচ্ছা সে গুণ্ডাগর্দি কর সকতা। খুন খারাবি আভি তক নেহি কিয়া। লেকিন লড়াই ঝগড়ে মে পাঁচ দশ আদমীকো গৌড় হাত তোড় দিয়া!

সাচ বাত?

হামলোগ ঝুট বোলনেবালা নেহি।

ঠিক হ্যায়। কাম পাক্কা হো গিয়া তুমহারা মরদকো। এক ধাওড়া মিল যায়েগা তুঝকো।

তু ইতনা জোর সে ঝুট বোলি!—রাস্তায় বেরিয়ে ফেকলুরাম সরবতিয়াকে বিস্ময় মিশ্রিত উক্তি করলো। সাদাসিধা ফেকলুরাম খনি মালিকের মনটা বুঝতে পারেনি। বুঝেছে তার বউ। শ্রমিকদের টাইট দেবার জন্য লেঠেল চাইছে মালিক। ফেকলুরামের তাগড়াই শরীরটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে।

ঝুট না বোলি, তো নোকরি না মিলি। তো কেয়া ওহি আচ্ছা হোগা?

মারপ্যাঁচ অত বোঝে না ফেকলু। সরবতিয়ার কথা শুনে কি আর উত্তর দেবে সে! কিন্তু মনটা তার খচখচ করতেই লাগলো।

তবে সরবতিয়া যা চেয়েছিলো, তা সে আদায় করে নিয়েছে। তার চাই ঝকঝকে ঝলমল জীবন।

সেই অজ গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবন থেকে সে অন্তত মুক্তির স্বাদ ছিনিয়ে নিলো।

দুই

মালিকের চাপরাশীর কাজ পেলো ফেকলুরাম নুনিয়া। তেল-চকচকে একযা মোটা লাঠি কাঁধে নিয়ে সে মালিকের অফিসঘরের সামনে বসে থাকে। কখনো বা খনি পিটের চারধারে পাক খায়। পাকানো গোঁফটাকে মুচড়ে মুচড়ে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলেছে সে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যে সব শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরিটুকু পায় না, তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখাই তার কাজ। দৌলতরাম তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝেই পিলে চমকানো চিৎকার করে উঠতে হবে তাকে।

হয়তো নাইট শিফটের কাজ চলছে। পিট টপে হেড গিয়ারের চাকা ঘুরে চলেছে। যান্ত্রিক ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছেই সমানে। ডুলি বোঝাই কয়লা ওপরে উঠে পাহাড় হয়ে যাচ্ছে। টন টন কয়লা। আগরওয়ালা তখন তার বাড়িতে সুখনিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু কয়লা ওঠার কামাই নেই। টাকার স্তূপ জমছে তার।

এমন সব রাতে সেই যক্ষের ধন আগলাচ্ছে ফেকলুরাম নুনিয়া। মদ খাওয়া

ধরেছে এখন। চোখ দু'টো তার সবসময়ই টকটকে লাল হয়ে থাকে। কয়েকদিন আগে দুই শ্রমিককে খুব পিটিয়েছে ফেকলুরাম। মালিক বলেছিলো, যাদা বেয়াদপি করছিলো নাকি লেবার দু'টো।

গভীর রাত। মোটা লাঠিখানা নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ঠক্-ঠক্ শব্দ করছে। বহুক্ষণ পর পর সে পিলে চমকানো শব্দে চিৎকার করে উঠছে—হোঁশিয়ার! সাবধান! হোঁশিয়ার!

শালতোড় খনির পিট টপে কাজ করতে করতে এই শব্দ শুনে প্রায়ই চমকে যায় পরিশ্রম ক্লান্ত মজুররা। ফেকলুরাম নুনিয়া এখন ওদের আতঙ্ক!

প্রায় দু'বছর হতে চললো। হ্যাঁ। এরই মধ্যে সরবতিয়া আর ফেকলুরামকে চিনে ফেলেছে শালতোড়ের মানুষ। ওদের ধাওড়া এখন চকচকে রঙ করা। সেখানে সবসময় রেডিয়ো বাজে। সরবতিয়ার শাড়ি-ব্লাউজে জলুশ ফেটে পড়ে। মাঝেমাঝে তার মরদকে নিয়ে সে নাচা-গানাওয়ালা হিন্দি ফিলিম্ দেখতে যায়।

আভি বহোৎ আচ্ছা সে আচ্ছা হ্যায় সরবতিয়া আউর ফেকলুরাম নুনিয়া। আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকার আধা-হিন্দি আধা-বাংলা ভাষা শিখে ফেলেছে ফেকলুরাম।

দৌলতরাম মাঝে মাঝে সন্ধের দিকে তাকে ডেকে পাঠায় তার নিজের বিশেষ ডেরায়। খনির শ্রমিকদের খবরাখবর নেয় সে ফেকলুরামের কাছ থেকে।

ফেকলুরাম?

জী হোজৌর।

খাদান কেমন চইলছে? সব ঠিক হ্যায় কেয়া?

হাঁ হাঁ। জরুর ঠিক। লেকিন!

কেয়া লেকিন?

কুছ কুছ বাতচিত শুনতা থা।—মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল ফেকলুরামের।

ক্যায়সে বাতচিত?

লেবরলোগকো তংখা যাদা কমতি হো। উসিসে রোটি কাপড়া ভি না হোই।

কৌন কৌ বোলা থা? দৌলতরাম নিমেষে জ্বলে ওঠে। একটু থতমত খায় ফেকলুরাম। ভোগপুর গ্রামের চাষার ছেলের সেই সরল সাদাসিধে মনটা অন্ধকারেব ভেতর থেকে উঁকি দেয়।

নেহি নেহি। অ্যায়সা কুছ নেহি।

তুম কুছ ছুপ যাতে হো ফেকলুরাম! বতা দো উসি কো নাম। কৌন হ্যায় উও হারামজাদে লোগ!

ফেকলুরাম পাল্টে গেছে আজ অনেকটাই। তবু তার বুকেব মধ্যে বিবেকটা খচ্ খচ্ করে খোঁচা দিচ্ছিলো। সে চুপ করে রইল।

দৌলতরাম গ্লাসে বিলিতি মদ ঢালে। বলে, পিয়ো ফেকলু!

ফেকলুরাম উদাস্ চোখে তাকায়।

আরে পিয়ো, পিয়ো! কোই বাত নেহি। সরাব হি তো জিন্দেগি হ্যায়!

রঙিন স্বপ্ন দেখায় সরবতিয়াও। সরাবি স্বপ্ন। আগরওয়ালা ফেকলুর পিঠ চাপড়ে দেয়।

পি লো ফেকলুরাম।

ফেকলুর মাথাটা ক্রমশ শূন্য হয়ে আসে। গ্লাসের সবটা মদ গলায় ঢেলে দেয়। ফের গ্লাস ভর্তি করে দেয় দৌলতরাম। গ্লাসের পর গ্লাস গলায় ঢালে ফেকলু। একসময় তার মন, তার বিবেক, তার বুদ্ধি, তার মনুষ্যত্ব ধুলো হয়ে যায়। মাথাটা ফাঁকা লাগে। কোনো কষ্ট, দুঃখ-দুশ্চিন্তা নেই। বুকের মাঝখান থেকে বিবেক হারিয়ে গেছে।

দৌলতরাম আগরওয়ালা ডাকসাইটে কয়লাখানি মালিক। শ্রমিকদের সামান্যতম প্রতিবাদকেও সেব রেয়াৎ করে না। সে এই সার কথা বোঝে, 'লেবরলোগ, মজুরলোগোকো কুত্তাকা মাফিক রাখ্‌খো। নেহি তো শির কা উপ্‌পর চড় জায়েগা।'

উনিশ শো একষট্টি শালের শেষের দিক। কয়লা খনি শ্রমিকরা চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে। কয়লা খনি মালিকরা তখনও শ্রমিকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করে চলেছে। শ্রমিক ধাওড়ার অপরিসর ঘুপচি ঘরের মধ্যে তাঁদের দিন গুজরান। যতটা বেশি খাটিয়ে যতটা কম মজুরি দেওয়া যায়—দৌলত আগরওয়ালার মতো মালিকদের এটাই ছিলো নীতি। শ্রমিকরা যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে, ওদের সব সময় সন্ত্রস্ত করে রাখো। কেউ যদি শির উঁচা করে কথা বলে, কেউ যদি আরো মজুরির দাবি তুলবার চেষ্টা করে স্রেফ খুন করে দাও।

তাই ওদের দরকার হয় ফেকলুরাম নুনিয়ার মতো একবগ্গা সিধা মানুষদের। ওরা পছন্দ করে সরবতিয়ার মতো মেয়েদের, যাদের রঙচঙে জীবনের প্রতি প্রচণ্ড লোভ।

দৌলতরামের ডেরায় বিলিতি মদ খেয়ে চুর হয়ে যায় ফেকলুরাম। দৌলত তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে কথা বলে।

ফেকলু?

হাঁ জী।

বুল্য ত বটে, কৌন লোগ আওর তংখা কে লিয়ে বোলা? বুল্য বুল্য! ডর কা কোই বাত নেহি বা! তুহার আউর আচ্ছা মকান মিল যাই। সরবতিয়া আউর

যাদা আচ্ছা সে রহেগা।

মালিক।

বুল্য বুল্য!

মিটিন হুঁইএওছে বটে।

কুথ্যাকে?

সুভাষ মান্ডির ঘরকে।

বটে বটে। কয় ট' মানুষ ছিল বটে মিটিনে?

তিন ট'। আওর ভি আছে ছুপ্যাকে।

হুঁ।—দৌলতরামের চোখ দু'টো আগুনের মতো লাল হয়ে ওঠে। সে ফেকলুর মুখের কাছে নিজের কানটা এগিয়ে দিয়ে বলে, আওর দো আদমী কওন?

বুঢ়া ভোম্বল সিং আওর দীপক মাহাতো।

আচ্ছা! বহোৎ খুব!

দৌলতরাম উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দু'টোয় ভয়ঙ্কর কুটিল ছায়া পড়ে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে। ইউনিয়নবাজি করেগা তু লোগ! কুত্তা কা মাফিক লাশ গির যায়ে গা।

তিন

দৌলতরাম আগরওয়ালা কোনো কাজ ফেলে রাখতে পছন্দ করে না। তা হলে এই রুক্ষ্ম মাটির দেশে পড়ে থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করা হতো না তার।

পরের দিন সন্ধ্যের শিফটের শেষে ফেকলুর ডাক পড়ে দৌলতরামের ডেরায়। গভীর রাতে মদে চুর হয়ে যখন সে ডেরা থেকে বাড়ির দিকে রওনা দেয়, তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে দৌলতরাম বলে, আজ রাত তেরে কো অভিষেক হোগা রে ফেকলুরাম। তব সে তু মেরা জিগরি দোস্ত বন যায়ে গা।

মালিক কা জিগরি দোস্ত! আরি ব্বাস্! সুখে আর গর্বে বুকের ছাতি ফুলে ওঠে ফেকলুর। নসিব মে লাগ যায়ে গা তো, একদিন হাম কোই এক খাদানকা মালিক ভি বন সকতা।

বেশ বয়েস হয়েছে ভোম্বল সিংয়ের। চেহারাটা এখনো ভালো। তবে সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রমের পাশাপাশি অভাবের ছাপও চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। ভোম্বল সিংয়ের বাবা খাদানে কাজ করার জন্য একদিন গোরখপুর থেকে এই বাংলার আসানসোলে চলে এসেছিলো। বাবা মারা গেছে। ওরা এখন এখানকার পাকাপাকি বাসিন্দা।

সে শালতোড় খনির লোডার। মঙ্গলবার সকাল ছ'টার শিফটে তার ডিউটি। ভোরে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে সাড়ে পাঁচটাতেই সে বেরিয়ে পড়লো ধাওড়া থেকে।

ধাওড়া থেকে খনি পিট কুড়ি মিনিটের রাস্তা। দু'পাশে পাথুরে জমি। পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তেই পথ চলেছে ভোম্বল সিং। রাস্তার ডান পাশে একটা পাথুরে টিবি পেরিয়ে এলো সে। ঠিক সেই মুহূর্তেই টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন। তার হাতে একটা লোহার রড। দ্রুত এবং নিঃশব্দে সে ভোম্বল সিংয়ের পেছনে চলে এলো। কোনো সময় নষ্ট না করেই ভোম্বল সিংয়ের মাথা লক্ষ্য করে লোকটা রড হাঁকালো। মাথার খুলিটা স্রেফ দু'ভাগ হয়ে গেল ভোম্বল সিংয়ের। সামান্য আর্ত চিৎকার উঠেছিলো। তাও দূরের কোনো মানুষের কানে গেল না।

পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে। ফেকলুরামের মুখে সেই সূর্যের আলো। এটা কোন মানুষের মুখ নয়। ফেকলুরাম যেন জন্তু। ভোম্বল সিংয়ের লাশটা টেনে হিঁচড়ে রাস্তার পাশে খাদে নামিয়ে দিলো ফেকলু। তারপর লোহার রডটা হাতে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে সে নিজের ধাওড়ার দিকে চলে গেল। ধাওড়ায় সরবতিয়া তখনো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে ফেকলুরাম সরবতিয়ার পাশে শুয়ে পড়লো।

দুপুর দু'টোর শিফটের অনেক পরেও যখন ধাওড়ায় ফিরলো না প্রৌঢ় ভোম্বল সিং, খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। জানা গেল, সে আজ খাদানেই যায়নি। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া গেল রাস্তার পাশের খাদ থেকে।

তোলপাড় শুরু হয়ে গেল শালতোড় খনি অঞ্চলে। শালতোড়ের অজাতশত্রু মানুষ বুড়া ভোম্বল সিং কো কৌন মার্ডার কিয়া? কিঁউ? কিঁউ? প্রশ্নটা ধাওড়া থেকে ধাওড়া নারী-পুরুষদের মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে আসে। শালতোড়ের মাটিতে, বাতাসে, গাছগাছালিতে দীর্ঘশ্বাস জমা হয়। কারো ঘুম আসে না। আবার কে খুন হবে কে জানে! খুন-খারাবির লাইন চলেছে কয়লাখনির জন্মের শুরু থেকেই।

খনি পিট থেকে বেরিয়ে সন্ধেয় ধাওড়ায় ফেরেনি সুভাষ মান্ডি আর দীপক মাহাতো। ভোম্বল সিংয়ের লাশ পুলিস মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবারের লোকজন গেছে। সুভাষ বা দীপক কেউ যায়নি তার ধারে কাছে।

খুব বেশি রাত হয়নি। রাত সোয়া ন'টা। ধাওড়া থেকে মাইলখানেক দুরে এক গ্রামে একটা বাড়িতে তখন মিটিঙে বসেছে বারোজন মানুষ। এখানেই আছে সুভাষ মান্ডি আর দীপক মাহাতো। আসানসোল টাউন থেকে এসছেন ওদের লিডার

দীনেশ বসু। ঘরে কেরোসিনের তিনটে ডিম বাতি জ্বলছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, তাবড় তাবড় লিডাররা এখানে মিটিং করছেন। কথা বলছিলেন দীনেশবাবুই।

দৌলতরাম আজও পর্যন্ত পালটা ঘা খায়নি। এবার খাবে। সুভাষ মান্ডি, কিছু জানতে পেরেছো?

স্বপ্না সোরেন, দিগম্বর সোরেনের বউ, সকাল ছ'টা নাগাদ ফেকলুরামকে একটা লোহার ডান্ডা হাতে নিজের ধাওড়ায় ঢুকতে দেখেছে।

বেশ ক'দিন ধরেই ফেকলু রাতে মদ খেয়ে বেরোচ্ছে আগরওয়ালার ডেরা থেকে।

দীপক মাহাতোর এই কথার সূত্র ধরে সুভাষ মান্ডি ফের বললো, ফেকলু একদিন আমার ঘরে বিড়ি চাইতে ঢুকেছিলো। সেদিন আমরা তিনজন মিটিং করছিলাম। আমাদের কথাবার্তার কিছু ও শুনতে পারে।

ঠিক আছে। সবটাই তোমাদের অনুমান। সন্দেহটাকে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, নিরপরাধ মানুষ যেন শাস্তি না পায়। তোমাদের টোপ দিতে হবে। যে ফাঁদে পা দেবে, তাকে চিনে নিও। সেই বুঝে ব্যবস্থা। আমি বাদ দিয়ে তোমরা এগারোজন আজ থেকে এই অঞ্চলের দায়িত্বে রইলে। প্রত্যেকটা লেবারের সঙ্গে ধীরে ধীরে, কৌশলে যোগাযোগ তৈরি করো।

অন্যান্য খনি অঞ্চলে যা অনেকদিন আগে শুরু হয়েছিলো, শালতোড়ে তা সবে শুরু হলো। দীনেশ বসু সেই রাতেই আসানসোল ফিরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, সুভাষ মান্ডি আর দীপক মাহাতো, তোমাদের দু'জনকেই বলছি। হুঁশিয়ার! মনে হচ্ছে তোমরা দু'জনেই এবার টার্গেট। চোখ-কান খোলা রেখো। টোপ ফেলবে। তবে নিজেরাই লাশ হয়ে যেও না যেন। আমরা বেশ ভালোমতোই জানি, দৌলতরাম কোনো কাজ ফেলে রাখে না।

সাইকেল চালিয়ে ওরা যখন নিজেদের ধাওড়ার কাছাকাছি এলো, তখন রাত সাড়ে বারোটা।

দীনেশ বসুর হুঁশিয়ারি ওদের কানে তখনো বাজছিলো। ওদের ধাওড়ার বেশ খানিকটা দূরেই অনেকগুলো বড় বড় গাছের ছায়া। সেখানে সাইকেল থামিয়ে দু'জন একটু চুপচাপ দাঁড়ালো।

ওদের মনে কিছু একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো। কিসের সন্দেহ? ওদের মন বলছিলো, সব কিছু ঠিকঠাক নেই!

আকাশে চাঁদ ছিলো। সেই চাঁদের ঢেলে দেওয়া জ্যোৎস্না খনি এলাকার পাথুরে জমিতে সমানে গড়িয়ে চলেছে। দূর দূর গ্রামগুলোতে যেন অদ্ভুত রহস্য জমাট বেঁধে আছে।

গাছপালা-ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে তার মাঝখানেই একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পেল সুভাষ এবং দীপক।

দেখছিস বট্যে?

হামাদের ঘরকে যেঁনছে।

হাঁ।

হুঁশিয়ার!

কে বটে? বুইঝত্যে পারছিস?

চিন্‌হা চিন্‌হা লাইগ্‌ছে।

ওরা সাইকেল দু'টো গাছতলার অন্ধকারে রেখে সেই ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে এগলো। ছায়ায় ছায়ায় যতটা আড়ালে থাকা যায়, ওরা চললো সেভাবেই।

ধাওড়ার সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ছায়ামূর্তি। লোকটার হাতে একটা লোহার ডান্ডা। সে সুভাষ মান্ডির ঘরের সামনে গিয়েই দাঁড়ালো। চাঁদের আলো একেবারে সোজাসুজি পড়েছে লোকটার মুখে।

চাতালের বকুল গাছের ছায়ার আড়াল থেকে সেই মুখটা স্পষ্টই দেখলো সুভাষ আর দীপক। তাদের বিস্মিত উক্তি — ফেকলুরাম!

ওদের অনুমান, ওদের সন্দেহ সব ঠিকই আছে।

আজ রাইতে আম্যিই টার্গেট বটে! — সুভাষ মান্ডি বললো।

হুঁ। তাই তো দেখছি।

ঠৈইস্যে মদ গিলছে বটে!

হুঁ। তাই হুঁশ নাই।

তুয়ার তালা মারা ঘরে টুকা দিচ্ছে।

সত্যিই, মদে চুর ফেকলুরাম সুভাষের ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছিলো।

দীপক একটু পেছনে। সুভাষ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেল। সুভাষের ধাওড়ার এ-পাশে একটা লাউমাচা। তার পিছনে সরে গিয়ে সুভাষ আস্তে করে বললো, কে?

চমকে গিয়ে পেছনে তাকালো ফেকলুরাম। দীপক মাহাতো ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে এসে কুয়োতলার থামের আড়াল নিয়েছে। দু'জনের চোখে ইশারা হয়ে গেল! সুভাষ মান্ডি আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছিলো, মদ খেয়ে ফেকলুর চোখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে গেছে।

ফেকলু লোহার রডটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে ঘুরে দাঁড়ালো। কাউকেই সে দেখতে পেলো না। তার চোখে এতই নেশার ঘোর, চারপাশ নজর করবে সে কোত্থেকে? কিন্তু শিকারকে বাগে পেলে সে সেই রডটা হাঁকাবার জন্য তৈরি। তার মস্তিষ্কে দৌলতরামের একটা কথাই গেঁথে আছে! — 'ফেকলুরাম! কাম একদম জলদি

সাফা কর দো। তুম মেরে দোস্ত বন যায়ে গা। জিগরি দোস্ত। বদল যায়ে গা তেরে জিন্দেগি।' লাউমাচার আড়াল থেকে সুভাষ মান্ডি প্রশ্ন ছুঁড়লো এবার।

ফেকলু! তু বুঢ়া ভোম্বল সিং কো খুন কিয়া! তু খুনি হ্যায়!

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলো লোকটা। নিমেষে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে লোহার রডটা ছুঁড়ে মারলো। তক্ষুনি না সরে দাঁড়ালে ভোম্বল সিংয়ের অবস্থাই হতো সুভাষ মান্ডির। লাউমাচাটা মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লো। মৃত্যু বলতে গেলে সুভাষকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল।

সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে ছুটে এসে ফেকলুরামকে সজোরে জাপটে ধরলো দীপক মাহাতো।

কিন্তু মত্ত হাতির বল এখন ফেকলুরাম নুনিয়ার শরীরে। পেশাদার খুনি হয়ে উঠেছে সে। একরোখা। দুঃসাহসী! ভয়ঙ্কর! এক ঝট্‌কা মারলো ফেকলু। সেই ঝটকায় এতই জোর, তাতে ছিটকে পড়লো দীপক মাহাতো। শান বাঁধানো চাতালে তার মাথা ঠুকে গেল। আঃ করে চিৎকার করে উঠলো সে। দুরন্ত ক্ষিপ্র ফেকলু তার বুকের ওপর চেপে বসে দু'হাতের থাবায় সাঁড়াশির মতো দীপকের গলা টিপে ধরলো। অসহায় কমজোরি দীপকের কিছু করার ছিলো না। অসম্ভব শক্তিশালী ফেকলুর সাঁড়াশি চাপে তার চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর ক্ষীণতম আলোও নিভে যাচ্ছিল।

মাতাল, একবগ্গা ফেকলুর আর কোনদিকে নজর ছিলো না। তারই লোহার রডটা সুভাষ মান্ডি যখন সমস্ত শক্তি জড়ো করে তার মাথায় বসিয়ে দিলো, মুহূর্তখানেক আগেও সে তা বুঝতে পারেনি।

মরে গেল ফেকলুরাম নুনিয়া। একটুর জন্য বাঁচলো দীপক মাহাতো। দলের আরো দু'এক জনকে ডেকে ফেকলুর লাশ বাঁধাছাঁদা করে দুপুর রাতে সাইকেলে চাপিয়ে ওরা দূর পথের দিকে যাত্রা শুরু করলো।

চার

পরের দিন দুপুর পেরলো। চারদিকে লোক পাঠিয়েও ফেকলুরামের হদিশ করতে পারলো না দৌলতরাম আগরওয়ালা। ধাওড়ায় সরবতিয়া এক মাথা দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। মালিক খবর পাঠিয়েছে, কোন চিন্তা নেই। ফেকলুকে ঠিক খুঁজে বার করবে তার লোকজন। সেই আশায় সে বসে আছে। শালতোড় কয়লা খনির দোর্দন্ডপ্রতাপ মালিকের কথায় অবশ্যই ভরসা রাখা যায়।

বিকেল সাড়ে চারটেয় খবর এলো, শ্যামলা গ্রামের কাছে অজয় নদীর চরের বালি খুঁড়ে ফেকলুরাম নুনিয়ার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিস।

ধাওড়ায় ধাওড়ায় আতঙ্ক। সন্ধের আগেই থেমে গেছে জীবনযাত্রা। শ্মশানের

নিস্তব্ধতা শালতোড় খনি এলাকায়। বৃদ্ধা হামিদা কাজি দীপা ছেত্রী আর নূরজাহানদের সামনে মন্তব্য করলেন, মওথ কো লাইন লাগ যায়েগা।

আসানসোল শহরে এক গোপনতম কুঠিতে মিটিংয়ে বসেছেন দীনেশ বসু। আজ আরো বেশি লোকজন। সুভাষ মান্ডি, দীপক মাহাতো, ভোম্বল সিংয়ের ছেলে ভানু সিং, পিতাম্বর মারান্ডি, যদুনাথ রাজোয়াররাও আছে। দীনেশবাবু বললেন, আজ শালতোড় কয়লাখনিতে প্রতিরোধ পর্বের অভিষেক হলো।

লোক পাঠিয়ে দৌলতরাম সববতিয়াকে ধাওড়া থেকে নিজের ডেরায় নিয়ে গেছে। তখন সন্ধে। সরবতিয়া খবর জানার পর আছাড়িপিছাড়ি খেয়েছে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে। ধাওড়ার মহিলারা ওকে ঘিরে ছিলো। ওকে সান্ত্বনাও দিয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা দূরত্ব ছিলো।

উদ্‌ভ্রান্ত অসংবৃতবেশ সরবতিয়া যখন মালিকের নিজস্ব ডেরায় এসে পৌঁছলো, তখন তার কান্নার শক্তি নেই। শুধুই ফোঁপাচ্ছে সে। মালিক অনেকক্ষণ দেখলো তাকে। যখন সে ফেকলুর জন্য চাকবি চাইতে এসেছিলো, সেদিনও তার মুখ-বুক-পায়ের গোছ এভাবেই দেখে নিয়েছিলো দৌলত।

সরবতিয়া!

সরবতিয়া শূন্য ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে।

যো হো গিয়া, উও সব ভুল যাও। হাম হ্যায় তুমহারা পাস।

মালিক, হাম কো দুনিয়া আন্ধার —

নেহি নেহি! সব ঠিক হ্যায়। — দৌলত ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। চোখের জল মুছিয়ে দেয়। কাছে টেনে নিয়ে বলে, ডরো মৎ! দুখ কা কোই বাত নেহি। চলো অন্দর।

লেকিন মালিক —

ইয়ে দৌলত তুমহারা হ্যায়।

কঠিন বাঁধনে সরবতিয়াকে বেঁধে ফেলে দৌলত। রোও মৎ!—বলে মুখ চেপে ধরে। শোক-দুঃখেরও সময় পায় না সরবতিয়া। সেই বিহ্বলতার মধ্যেই দৌলতের ডেরায় প্রথম রাত কেটে যায় সরবতিয়ার। তারপর আরো অনেক রাত।

চকমকে ঝলমল জীবনের পথ ধরে অন্ধকারের পথে চলতে শুরু করে সরবতিয়া নুনিয়া।

দীপ্ত আগুনশিখা

তেতে আছে পাথুরে মাটি। সবে শীত পেরিয়েছে। এরই মধ্যে সূর্য একেবারে লোহাগলানো উত্তাপ ঢেলে দিচ্ছে। রাজ্য ঝাড়খণ্ড। কয়লাখনির হেডগিয়ারের বিশাল চাকা ঘুরেই চলেছে। ঘূর্ণায়মান গিয়ার রোপে লাগানো খালি ডুলিগুলো খাড়া সুড়ঙ্গে নামিয়ে দিচ্ছে। ডুলিগুলো কয়লা ভর্তি হয়ে ওপরে উঠে আসছে।

বাগডিগি কয়লাখনি। প্রাণবন্ত খনিমুখ। যান্ত্রিক ঘর্ঘর শব্দাবলীর সাথে খনি শ্রমিকদের কথাবার্তা চিৎকার চেঁচামেচি সব মিলেমিশে একাকার হয়েই তার কর্মচঞ্চলতা।

বাগডিগি খনির পিট বটমের সাত নম্বর সিমে কয়লা কাটার কাজ চলছে। কাজ করছে শৈল বাউরি, দীনু দফাদার, কৈলাস পাশোয়ান, প্রশান্ত হেমব্রম, রাজেশ সিং, সুজন বাদ্যকররা। প্রায়ান্ধকার সুড়ঙ্গ ব্যস্ততায় মজে আছে। শ্রমিকদের ক্যাপল্যাম্পের আলোগুলো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কয়লার ঘন কালো দেওয়ালের যত্রতত্র সেই আলোর রেখাগুলো বারেবারে লাফ দিয়ে উঠছিল। এই কাঠিন্যের মধ্যেও তাই তৈরি হয়েছিল এক মায়াময় পরিবেশ।

সাত নম্বর সিমের ছয় নম্বর গ্যালারিতে কাজ চলছে। একটু আগেই ইলেকট্রিক ডেটোনেটর দিয়ে কয়লার পুরু আস্তরণের দেওয়ালে বাস্টিং করা হয়েছে। তাই সুড়ঙ্গে বারুদের গন্ধ। কয়লার চাঙড়গুলো ফেটে বেরিয়ে এসেছে। এস ডি এল অর্থাৎ সাইড ড্রেজিং লোডার মেশিন দিয়ে কয়লা তুলছিল শৈল বাউরি এবং

কৈলাস পাশোয়ান।

প্রথম দফা বার্স্টিংয়ের পর আঠাশজন শ্রমিক প্রায় সমস্ত কয়লাই কেটে টবে তুলে দিয়েছে। দুটো ওোহার মেশিন কাজ করছিল। দীনু দফাদার, প্রশান্ত হেমব্রম, সুজন বাদ্যকররা বেলচা দিয়েই কয়লা লোডিং করছিল। কালো হীরের খাদ। এই কালো হীরেই ওদের জীবন-জীবিকার উৎসমুখ।

কয়লার চাঙড়ে গাঁইতির ঘা মারতে মারতেই সরিফুল ছড়া কেটে চলেছে—

খড়ি খড়ি মাট্যি
গাঁইতি দিঁইয়ে কাট্য।
গাঁইতিতে নাইক্য ধার
যা চইল্যেঁ যা, গাঁয়ের পার।

ঘরঘর শব্দ করতে করতে লোডার মেসিন সিমের মুখে চলতে থাকে। ওখানে লোহার দড়িতে বাঁধা খালি টবগুলো নামছে। কয়লাভর্তি টব পিট মাউথে উঠে যাচ্ছে। শ্রমিকদের রক্ত-ঘাম ঝরানো কালো সোনা—কয়লা সেখান থেকে চলে যাবে দূর-দূরান্তে।

দীনু দফাদার দেওয়ালে ঝুলে থাকা সর্বশেষ চাঙড়গুলো গাঁইতি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করছিল। কাজের আনন্দে মেতে থাকার জন্য সেও তার মোটা গলায় সুর ভেঁজে চলেছে—

ঠাঁটরবাজি করিস নাকো,
দম করেছিস শেষ।
কাছাড় খাঁইয়ে উলটপালট,
কাদায় ভিজা বেশ।

কিন্তু হঠাৎই গান বন্ধ করলো দীনু দফাদার। কয়লার স্তূপ থেকে গাঁইতি ওঠাতেই গাঁইতির মাথা থেকে টপ্-টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়লো।

ই জল কুথা থিক্যে আইল বটে!—ভাবছিল দীনু।

সে সামনের দিকে এগিয়ে গ্যালারির শেষপ্রান্তের কয়লার দেওয়াল তার ক্যাপল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করছিল। মনে হল দেওয়ালটা ভেজা ভেজা। সে দেওয়ালে ডান হাতের আঙুল বুলিয়ে দেখতে লাগল। আঙুলে জল এসে যাচ্ছে। হাতের চেটো দেওয়ালে ছোঁয়ামাত্রই চেটো ভিজে গেল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো।—ইখ্যানে জল কেনে?

সে হাঁক পাড়লো—আরে এ কৈলাস! শৈল! ইধার আও তো!

খনির সুড়ঙ্গে কাজ করতে করতে সবার মনেই এক ধরনের উৎকণ্ঠা পাক খেতে থাকে সবসময়। দীনুর ডাকে ওরা ছুটে গেল গ্যালারির শেষ প্রান্তে।

কেয়া হুয়া?

জল গড়াঁইন্‌ছে বটে!

কুথ্যাকে?

ইখ্যানে বটে।

একগুচ্ছ ক্যাপলাম্পের আলো পড়লো সেই দেওয়ালে। দেওয়াল ধরে ধরে ওরা যাচাই করে নিচ্ছিলো সত্যিই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে কিনা।

হাঁ। এ তো সহি বাত। পানী আর রহা হ্যায়। লেকিন কাঁহা সে?

ইহাঁ কিঁউ পানী আয়েগা?

আঠাশজন শ্রমিকের কপালেই চিন্তার রেখা। ওরা কাজ বন্ধ করে দিল।

শিফ্‌ট শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেক অগেই সাত নম্বর সিমের সব শ্রমিক ওপরে উঠে এল।

দুই

খনি ম্যানেজার অলোক উপাধ্যায় সাত নম্বর সিমের মজদুরদের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলেন। আর দেরি না করে তিনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অসিত ঘোষ আর বাগডিগির সার্ভেয়ার রামস্বরূপ পাণ্ডেকে নিয়ে পিট বটমে নামলেন।

সেই সাত নম্বর সিম। মাথায় ক্যাপল্যাম্প ছাড়াও তিনজনের হাতে টর্চও ছিল। সেই আলোয় সিমের গ্যালারি-অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। জমাটবাঁধা কয়লার পুরু আস্তরণ হাত দিয়ে পরখ করে দেখলেন তিনজনই।

এখন তো জল দেখা যাচ্ছে না।

তা ঠিক। তবু ভাল করে দেখুন পাণ্ডেজী। অসিতবাবু. আপনার কি মনে হচ্ছে?

এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু বুঝতে পারছি না। ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

আমারও তাই মনে হয়।

পরে ওপরে উঠে খনি-সার্ভেয়ার, ম্যানেজার আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ম্যাপ নিয়ে বসলেন। অনেক মাপজোক করে সার্ভেয়ার রামস্বরূপ পাণ্ডে অলোক উপাধ্যায়কে বললেন, ম্যানেজারসাহেব, মনে হচ্ছে, বাগডিগির সাত নম্বর সিমের ওয়ার্কিং যতদূর হয়েছে, তাতে তা পাশের পরিত্যক্ত জয়রামপুর কোলিয়ারির কাছে চলে এসেছে। আমাদের অ্যালার্ট হওয়া দরকরা। বন্ধ হয়ে যাওয়া জয়রামপুর কোলিয়ারির ভ্যাকান্ট সিমে লাখ লাখ গ্যালন জল ভরে রাখা হয়েছে।

দুই খনির মাঝখানের বেরিয়ার ভেঙে গেলে তো সর্বনাশ!

হ্যাঁ। আপনি জেনারেল ম্যানেজারের সঙেগ কথা বলুন।

ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার বিজয়শরণ শ্রীবাস্তব। বাগডিগি কয়লাখনির ম্যানেজার অলোক উপাধ্যায় যখন তাঁকে টেলিফোন করলেন, তখন তিনি ঝরিয়ার অফিসে ছিলেন না। উপাধ্যায় তাঁকে পেলেন তাঁর

বাংলোবাড়িতে।

হ্যালো স্যার! হাম বাগডিগি মাইনকো ম্যানেজার অলোক উপাধ্যায় বোল রহা হুঁ।

বোলো উপাধ্যায়, কেয়া হুয়া?

খাদানকো সাত নাম্বার সিমমে কোই গড়বড় লাগতা।

কিউ? ক্যায়সে গড়বড়?

পানী আতা হ্যায় ওয়র্কিং এরিয়া সে।

এই কথায় হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন জেনারেল ম্যানেজার। বললেন, আরে উপাধ্যায়, পানী নেহি আয়েগা তো কেয়া খাদাম মে দুধ আয়েগা?

লেকিন লাগতা হ্যায় হামলোগ হুঁয়াপর ডেঞ্জার লাইন কা বগল মে আ গিয়া।

এ কেয়া তুমহারা রিয়ালাইজেশন হ্যায়?

হাঁ। মেরে সার্ভেয়ার কো ভি সহি আন্দাজ থা।

দেখো, আন্দাজমে কুছ নেহি হোগা। পার্টিকুলার ডকুমেন্টস চাহিয়ে।

লেকিন—

লেকিন-উকিন ছোড়ো! আভি কাম চলেগা। বাদ মে দেখা যায়েগা, কেয়া করনা হ্যায়।

একজন ওপরওয়ালা খনি ইঞ্জিনিয়ারের মুখে এই কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন উপাধ্যায়। তিনি বি সি সি এলের লোদনা এরিয়া অফিসের সার্ভে অফিসার ও মাইন্স সেফটি অফিসারকেও ফোন করলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই জেনারেল ম্যানেজারকে টপকে কোনও কথা বলতে রাজি নন।

সেই রাত বলতে গেলে নিদ্রাহীন কেটে গেল উপাধ্যায়ের। বিছানায় শুধু ছটফট করতে লাগলেন তিনি। পত্নী ঊষাদেবী স্বামীর মানসিক যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?

না না। সব ঠিক আছে।

তা হলে তোমার অফিসে কি কিছু হয়েছে? কিছু তো একটা হয়েছেই! না হলে তুমি এমন ছটফট করবে কেন?

শেষ পর্যন্ত আর নিজের মনোকষ্ট চেপে রাখতে পারলেন না উপাধ্যায়। স্ত্রীকে খুলে বললেন সব কিছু।

ওরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমিকদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে দ্বিধা করছে না!

ওরা কারা?

জিম এম বিজয়শরণ শ্রীবাস্তব।

কেন, কী হয়েছে?

আমি চাইছি, বাগডিগি মাইন্সের সাত নম্বর সিমের কাজ এক্ষুনি বন্ধ করে দিতে।

কিন্তু কেন চাইছো?

আমার মনে হচ্ছে, পাশের পরিত্যক্ত জয়রামপুর মাইন্সের বন্ধ সিমের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে বাগডিগির সাত নম্বর সিম। জি এম সেটা মানতেই চাইছেন না। ওদের লোভের শেষ নেই। আরও কয়লা তুলবে ওরা ওখান থেকে।

আর কাউকে জানিয়েছো?

আমাদের লোদনা এরিয়া অফিসের সার্ভে অফিসার আর মাইন্স সেফটি অফিসারকে টেলিফোন করে রিপোর্ট দিলাম।

ওরা কী বললো?

সব্বাই লোভী। প্রমোশনের লোভ ওদের মগজে এমনভাবে ঢুকেছে যে, বিপদের কথা ওদের মাথা থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। জি এম এখন ডিরেক্টর হবার স্বপ্নে মশগুল। অন্যান্যদেরও তেমনই প্রমোশনের লোভ রয়েছে।

এর সাথে প্রমোশনের কী সম্পর্ক?

বি সি সি এল চাইছে, আরও বেশি কয়লা তোলা হোক। ওরা যেন তেন প্রকারে তাই করে দেখাতে চাইছে। তা হলেই ওপরওয়ালারা খুশি হবেন। প্রমোশন হবে।

ঠিক আছে। তুমি ঘুমোও—ঊষাদেবী স্বামীর মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, হাল ছেড়ো না। কালকে পিটে যাও। গিয়ে ফের সমস্যাটা ওপরওয়ালাকে জানাও।

হ্যাঁ, ঘুমনো দরকার। কালকে অনেকগুলো কাজই করতে হবে। বলে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন উপাধ্যায় সাহেব। স্ত্রীকে বললেন, এক গ্লাস জল দাও।

এবার তিনি টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেন। ঊষাদেবী জলের গ্লাস এনে রাখলেন টেবিলে। স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন একান্ত নির্ভরতায়।

উপাধ্যায় জলটুকু খেয়ে নিয়ে তার ব্যক্তিগত মাইনিং ডায়েরির পাতা খুলে লিখতে শুরু করলেন।

"বাগডিগির পাশের পরিত্যক্ত জয়রামপুর খনি লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। আমার সার্ভেয়ার এবং মাইনিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমিও একটি বিষয়ে একমত, জয়রামপুর খনির জলভর্তি সিমের খুব কাছে চলে এসেছে বাগডিগির সাত নম্বর সিম। একটি খনির কয়লা উত্তোলন বন্ধ। সেটি জল দিয়ে ভরাট করা। পাশেরটি চালু। এই অবস্থায় কোল মাইন্স রেগুলেশন

আইন অনুযায়ী দুই খনির মাঝের দূরত্ব যাট মিটার হতেই হবে। আমার সার্ভেয়ারের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দুই খনির 'বেরিয়ার' এগারো মিটার দাঁড়িয়ে আছে। এতে কোল মাইন্স রেগুলেশন আইনকে সরাসরি অগ্রহ্য করা হয়েছে। এই মুহূর্তে দুই খনির মধ্যবর্তী 'বেরিয়ার' বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।''

পয়লা ফেব্রুয়ারি, দু'হাজার এক, তারিখ লিখে অলোক উপাধ্যায় ডায়েরির পৃষ্ঠা বন্ধ করলেন। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে বিছানায় চলে এলেন তারপর।

তাঁর স্ত্রী, ঊষা উপাধ্যায়, সুন্দরী, তেজস্বিনী মহিলা, যিনি স্বামীকে বুঝতে পারেন ষোল আনাই। স্বামীর চাঞ্চল্য, বিরামহীন মনোকষ্ট হালকা করতে, সেই বিষণ্ণ রাতে চুম্বনে চুম্বনে ভরে তুললেন তাঁকে। স্বামীকে দিলেন প্রণয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ। সেই রাতে পতিপ্রেমের উজ্জ্বলতায় গরবিনী হয়ে উঠলেন ঊষাদেবী।

তিন

আরও একটা সকাল এলো। আজ দোসরা ফেব্রুয়ারি, দু'হাজার এক সাল। যেমন প্রত্যেক দিন ডিউটিতে বেরোন, আজকেও সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে পড়লেন অলোক উপাধ্যায়। আজকের দিনটিও ছিল রৌদ্র-উদ্ভাসিত।

দশটার মধ্যে বাগডিগির পিটে পৌঁছে গেলেন তিনি। তিনি ঠিকই করেছিলেন, নিজের বক্তব্য থেকে এক চুলও নড়বেন না। তার জন্য যতদূর যেতে হয়, যাবেন। নিজের অফিসঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেই তিনি সররাসরি ডিরেক্টরকে টেলিফোন করলেন।

কিন্তু হা হতোস্মি। ডিরেক্টর কোনও নতুন কথা বললেন না। মোদ্দা কথা হল, এখন কাজ চালিয়ে যাও। পরে জি-এম' এর সঙ্গে আলোচনা করে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।

তা হলে? কী করবো এখন আমি?

কি মনে করে হঠাৎ চমকে উঠলেন উপাধ্যায়। ওদের তো শিফট চালু হয়ে গেছে। তিনি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অ্যাটেনডেন্টের ঘরে গেলেন।

সাত নম্বর সিমে ওরা কি কাজ করতে নেমেছে?

হ্যাঁ স্যার।

ক'জন?

ত্রিশ জন।

শুনে ধক্ করে উঠলো উপাধ্যায়ের বুক। ওরা কী বার্স্টিং করে ফেলেছে? নাকি করেনি। অথবা বার্স্টিং করলেও অঘটন ঘটেনি। হয়তো আমার অনুমানটাই ভুল! হে ভগবান, আমার সার্ভেয়ারের হিসেব যেন ভুল হয়। বেরিয়ারের কয়লার

দেওয়াল যেন যথেষ্ট জায়গা জুড়ে থাকে।—এসব কথা ভাবতে ভাবতে পিট মাউথের দিকে ছুটে গেলেন উপাধ্যায়। ডুলিতে উঠতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালেন।

আমি নিচে নামলেই কি এই সমস্যা মিটবে?

বাগডিগি কয়লাখনির ম্যানেজার অলোক উপাধ্যায় দেখছিলেন, তখনও ডুলিতে মজদুররা নিচে নামছে। এই শিফটে মোট একশো পঁয়ষট্টি জন শ্রমিক-কর্মচারী পিট বটমের বিভিন্ন সিমে কাজ করবে। এর মধ্যে সাত নম্বর সিমের ছয় নম্বর গ্যালারিতে ত্রিশ জন।

না! এতগুলো মানুষকে আমি এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।—মনে মনে একথা ভেবেই তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। তৈরি হয়ে নিয়ে উঠে পড়লেন ডুলিতে।

ডিপে নামছেন উপাধ্যায়। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর স্নায়ুগুলো দপদপ করছিল। একটা খনির ম্যানেজার তিনি। তিনি ষোলআনা নিশ্চিত, শ্রমিকরা চরম বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তিনি কিছু করতে পারছেন না। তিনি একেবারেই অসহায়।

ডুলি সাত নম্বর সিমে চলে এসেছে। নেমেই ছুটলেন ছ'নম্বর গ্যালারিতে। শৈল বাউরি আর প্রশান্ত হেমব্রম এগিয়ে এলো।

কী স্যার?

বার্স্টিং হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

কোনও সমস্যা হয়নি কতো?

হয়নি। তবে দেওয়াল চুঁইয়ে বেশ জল পড়ছে।

চলো চলো। দেখি।

গ্যালারির শেষ প্রান্তে এসে উপাধ্যায় চমকে গেলেন। আতঙ্ক বিস্ফারিত কণ্ঠে বললেন, সর্বনাশ!

কয়লার দেওয়াল থেকে দু-তিনটে ফুটো দিয়ে কলের মতো জল পড়ছে। উপাধ্যায় চিৎকার করে উঠলেন।

সবাই ওপরে উঠে যাও! ডিপের কাছে চলে যাও এক্ষুনি!

কেন স্যার?

কোনও কথা নয়! তোমরা এক্ষুনি ওপরে ওঠো! আমি হুকুম করছি, এক্ষুনি ওপরে ওঠো! যাও!

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন খনি ম্যানেজার অলোক উপাধ্যায়। তাঁর এই হুঙ্কার সিমের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে অনেক অনেক প্রতিধ্বনির জন্ম দিলো।

তারপরই বিকট শব্দ। ত্রিশ জন শ্রমিক আর উপাধ্যায় তাঁদের জীবনে

শেষবারের মতো দেখে নিলেন সেই ভয়ানক দৃশ্য।

গ্যালারির শেষ প্রান্তের কয়লার পার্টিংকে নিমেষে চুরমার করে বাঁধভাঙা জলরাশি ঢুকতে লাগলো সেই সুড়ঙ্গের ভেতর। পরিত্যক্ত জয়রামপুর কয়লাখনিতে বোঝাই কয়েক লক্ষ গ্যালন জলের সেই বিপুল চাপের মুখে এই একত্রিশজন মানুষ কী করবে? '

ওঁরা কয়েকজন ছুটতে ছুটতে ডিপের মুখে ডুলির কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু বেরিয়ারের আর সামান্যতম বাধাও ছিল না। শেষ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ গ্যালন জলের বিপুল চাপ আছড়ে পড়ল সাত নম্বর সিমে। যেন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। সেই একত্রিশজন মানুষ বেশি কিছু ভাবার আর কোনও অবসর পায়নি। তুমুল জলরাশির অভিঘাতে, সাড়ে চারশো ফুট মাটির নিচে বেঁচে থাকার সামান্য সুযোগও সেখানে ছিল না। এখানে মৃত্যু ছিল সহজ এবং সাবলীল। যার আর-এক নাম সলিল-সমাধি। তাঁদের জীবনের শেষতম আর্তনাদ, শেষতম ইচ্ছা অথবা সর্বশেষ হাহাকার অন্ধকার জল পরিপূর্ণ সুড়ঙ্গে আটকা পড়ে গেল। খেলা পৃথিবীর আলোবাতাসে সেই কণ্ঠস্বরগুলো আর উঠে আসতে পারলো না।

হ্যাঁ, মাটির ওপর ভেসে বেড়াতে লাগলো মৃতদের বাবা-মা আত্মীয় পরিজনের বিলাপ। স্ত্রীদের বিরামহীন ক্রন্দনধ্বনি। সন্তানরা বিহ্বল। কেউবা নির্বাক। বাগডিগির আকাশে-বাতাসে পরতের পর পরতে জমতে লাগলো হাহাকার আর দম বন্ধ করা বিষাদের কালো ছায়া।

চার

উনিশশো ছাপ্পানো সালে আসানসোলের বড় ধেমো খনিতে, আর উনিশশো উননব্বই সালে মহাবীর কয়লাখনিতে জল ঢুকে গিয়েছিল এভাবেই। তবে ডুবন্ত খনিকর্মীরা বেঁচে ফিরে এসেছিলেন। তাই ক্ষীণ আশায় অপেক্ষা করছিলেন ঊষা উপাধ্যায়। দীর্ঘশ্বাস, কান্না আর স্বজন-হারানো বিলাপের মধ্যে একত্রিশটি পরিবার একটা আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই প্রদীপটি নিভে গেল। ন'দিন পরে প্রথমে তোলা হল দশ জনের মৃতদেহ। তার মধ্যে অলোক উপাধ্যায়ও ছিলেন।

ঊষাদেবীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ হলো। তিনি দেখলেন, তাঁর স্বামী একত্রিশজন মৃত খনিকর্মীর মধ্যে অন্যতম একটি লাশ। এ ক'দিন অঝোরে কেঁদেছেন ঊষাদেবী। এখন আরা তিনি উচ্চপদস্থ খনি অফিসারের ঘরণী নন। তিনি এখন খনি দুর্ঘটনায় মৃত একত্রিশজনের মধ্যে একজনের বিধবা পত্নী।

দমকে দমকে কান্না ঠেলে আসে তাঁর। তিনি তো জানেনই, এই পরিস্থিতি

রুখে দেওয়া যেত। কিন্তু যাঁদের সেই কাজটি করার কথা ছিল, তাঁরা তো করলেন না।

উত্তাল হয়ে উঠেছে ক'দিন ধরে বাগডিগি অঞ্চল। শুধু মৃত শ্রমিকদের মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্রকন্যারা নয়, হাজার হাজার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। মিছিল হচ্ছে। মিটিং হচ্ছে। দাবি উঠেছে, শ্রমিকদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। ঊষা উপাধ্যায় পাথরের মূর্তির মতো খোলা জানালার ধারে বসে বসে দেখেন সবকিছু। স্বজন-হারানো নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোরদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে যায়।

ঊষাদেবীর মা-বাবা-ভাই এসেছে বাগডিগিতে। ঊষাদেবীর কোনও সন্তান নেই। ওঁরা তাকে নিয়ে যেতে চান।

আজ ষোলই ফেব্রুয়ারি, দু'হাজার এক সাল। দুঃস্বপ্নের সেই ঘটনার পর দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন বাগডিগি অঞ্চলে ঝড় বয়ে যাচ্ছে হাজারো মানুষের।

সেদিন লোদনা এরিয়া অফিসর থেকে সার্ভে অফিসার জয় চ্যাটার্জি ঝরিয়াতে জি এম বিজয়শরণ শ্রীবাস্তবকে টেলিফোনে ধরলেন।

হ্যালো শ্রীবাস্তবজী!

বোলিয়ে চ্যাটার্জি!

দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। বাগডিগির লেবারগুলো দেখছি এখনও ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

আরে, আহিস্তা চলো চ্যাটার্জি। যাদা বুরা ইনসিডেন্ট হো গিয়া। সামহালকে চলনা হোগা। অল ইন্ডিয়া নিউজ হো গিয়া বাগডিগি অ্যাকসিডেন্ট।

হ্যাঁ, তা ঠিক। উপাধ্যায় অবশ্য আমাকে—

ব্যস, ব্যস! উপাধ্যায় কো বাত ছোড়ো। যো মর গিয়া, উও তো মরই গিয়া। লেকিন যো লোগ জিন্দা হ্যায়, উসি কে লিয়ে সোচো জী!

জিন্দা লোগ তো রোজ রাস্তায় নেমে চিল্লামিল্লি করছে!

আরে ভাই, যো লোগ চুপ হ্যায়, উসকে পাস যাও!

কৌন হ্যায় উও!

উপাধ্যায় কো ওয়াইফ, ঊষা উপাধ্যায়। বিউটিফুল লেডি।

শ্রীবাস্তবের এই কথা শুনে সার্ভে অফিসার চ্যাটার্জির চোখদুটো চকচক করে উঠলো।

রতনে রতন চেনে। শ্রীবাস্তব চ্যাটার্জিকে ঠিক চিনেছিল।

সেদিন সন্ধেতেই লোদনা থেকে সরাসরি জিপ চালিয়ে বাগডিগিতে হাজির

হলো জয় চ্যাটার্জি। এবং সোজা উপাধ্যায়ের এইচ আইজি কোয়ার্টারে।

ওঁরা চ্যাটার্জিকে ড্রয়িংরুমে বসালো। উষাদেবী ও তাঁর মা-বাবা তিনজন এসে বসলেন খানিক পরে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে চ্যাটার্জি দেখছিল উষাদেবীকে। কালোপাড় সাদা শাড়ি পরা সদ্য বিধবা উষা উপাধ্যায়। শোকস্তব্ধ। সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার মতো সাহস হচ্ছিল না চ্যাটার্জির। মনে হচ্ছিল, উনি যেন তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছেন। একটু ইন্ধন পেলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবেন।

মহিলাদের সামনে কোনওকালেই অস্বস্তি বোধ করে না চ্যাটার্জি। বরং তখন তার কথার ফুলঝুরি ছোটে। কিন্তু এখন কেন এ-রকম হচ্ছে? সে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাকে আসল কথাতে আসতে হবে।

এমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সত্যিই বেদনাদায়ক। জি এম শ্রীবাস্তব সাহেব আপনাদের পরিবারকে পার্সোনালি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এই কথায় উষা উপাধ্যায়ের মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

রিয়েলি, আমরা এই ঘটনায় সাংঘাতিক হার্ট হয়েছি।

সমস্ত ঘর নিশ্চুপ। বড্ড অস্বস্তি বোধ করছিলেন সার্ভেয়ার অফিসার জয় চ্যাটার্জি।

তবে মিসেস উপাধ্যায়, আমরা বি সি সি এল কর্তৃপক্ষ আপনাকে সবরকমের সহযোগিতা করতে তৈরি আছি। মৃত এক্সিকিউটিভের স্ত্রী হিসাবে আপনি সমস্তরকম সুযোগসুবিধা পাবেন।

সমস্ত রকমের সুবিধা বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন? আপনি কি কোম্পানির নির্দেশ নিয়ে এসেছেন? কাগজপত্র এনেছেন?—জিজ্ঞেস করলেন উষাদেবীর বাবা।

আমি জি এম বিজয়শরণ শ্রীবাস্তবের মেসেজ নিয়ে এসেছি। তিনি বলেছেন, এই কোয়ার্টারেই আপনি থাকতে পারবেন। যত বেশি সম্ভব টাকা কম্পেনসেশন হিসাবে আপনার হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা তিনি দেখবেন। সেটা দ্রুতই করা হবে। প্রয়োজনে আপনাকে এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে চাকরির ব্যবস্থা করতেও তিনি বোর্ড মিটিঙে প্রস্তাব রাখবেন। তবে উষাদেবীকে অবশ্য জি এম'এর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

আমি এখনা থেকে এই মুহূর্তে কোথাও যেতে চাইছি না।

উষাদেবীর কঠিন-নিষ্কম্প-ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর শুনে আরও ম্রিয়মান হয়ে পড়লো সার্ভে অফিসার।

সরি মিসেস উপাধ্যায়। এই অবস্থায় আপনাকে ঝরিয়া যেতে বলাটা আমার ঠিক হয়নি। তবে মিসেস, শোক কাটিয়ে উঠতেই হবে। মিস্টার অলোক উপাধ্যায়ের

মতো দক্ষ একজিকিউটিভকে হারিয়ে আমরা কি শোকাচ্ছন্ন নই?

তা তো বটেই। সেই জন্যই আপনাদের রেসকিউ টিম ঘটনার দু-দিন পর এলো। ন'দিন পরে দেহগুলো পাওয়া গেল।

ঊষা উপাধ্যায়ের চিন্তার ধারার কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না চ্যাটার্জি। ক্রমশ খেই হারিয়ে ফেলছিল।

আমরা স্বীকার করছি, আপনার ক্ষোভ রিয়েলি জাস্টিফায়েড। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই হবে। জি এম বলছিলেন, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেওয়া হবে। আপনার অল্প বয়েস। একটা দুর্ঘটনা তো—

এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়! জ্বলে উঠলেন ঊষা উপাধ্যায়।—এটা মাসকিলিং! হত্যা,! হ্যাঁ, হত্যা!

কি বলছেন মিসেস! আমি—

ঊযাদেবী সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঋজু চেহারা। চোখজোড়ায় আগুনের দীপ্তি।

আপনি হয়তো কিছুই বুজতে পারছেন না! কিনু পয়লা ফেব্রুয়ারি বিকেলে উপাধ্যায় আপনাকে টেলিফোন করেননি? জি এম'কে টেলিফোন করে উনি এই বিপদের কথা আগাম বলেননি? এছাড়াও তিনি সেদিন মাইন্স সেফটি অফিসারকেও ফোন করেছিলেন।

হ্যাঁ ম্যাডাম। জি এম সিচুয়েশনটা রিয়েলাইজ করতে পারেননি। সত্যি এর কোনও মাপ হয় না। তবু আমাদের এর পরের দিনগুলোর কথা ভাবতেই হবে। মাইন্স তো চালাতেই হবে। তাই ভবিষ্যতে যাতে কোনো দুর্ঘটনা—

আবার দুর্ঘটনা বলছেন! আপনারা সব জেনেও পিট চালু রাখলেন। পাশের খনির জল বাগডিগিতে ঢুকে পড়লো। তবু বললেন দুর্ঘটনা? আপনারা ইচ্ছে করেই একত্রিশজন মানুষকে খুন করেছেন।

মাথা নিচু করে বসে রইলো চ্যাটার্জি। ঊষাদেবীর বাবা উঠে গিয়ে উত্তেজিত মেয়েকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, থাক মা। এমন দুঃখের সময়ে রাগারাগি করে আর কী হবে?

আমিও তাই বলছি আঙ্কল! ভবিষ্যতের কথা—

আপনাদের ভবিষ্যতের কথা মানে তো আরও বেশি কয়লা তোলা। আপনাদের আরও উঁচুপদ। প্রমোশনের পর প্রমোশন! শুনুন! অলোক উপাধ্যায় বেশি বেশি টাকা কম্পেনসেশন পাবার আশায় সেদিন খনিতে নামেননি। নিজের স্ত্রীকে এক্সিকিউটিভের চাকরিতে বসাবার জন্য খনিতে নামেন নি। তিনি ত্রিশজন মজদুরের প্রাণ বাঁচাতেই খনিতে নেমেছিলেন। আমিও তাই চাই। ত্রিশটি ফ্যামিলির আর্থিক সিকিউরিটি, আর সব সুযোগ।

সে সব তো কোম্পানি করবে।

আর কোনওদিন এমন ঘটনা ঘটবে না, এমন গ্যারান্টি কি কোম্পানি দিতে পারবে?

এই কথার উত্তর কী করে দেবে একজন এরিয়া সার্ভে অফিসার? সে চুপ করে রইল। চ্যাটার্জি এখন এই আগুনের শিখার সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কোনওক্রমে সে তাই করলো।

পাঁচ

বাইরে হাজার হাজার শ্রমিক-মজদুর ক্ষোভে উত্তরল ছিল প্রতিদিন। গত দু'সপ্তাহ ধরে ঘরবন্দী ঊষা উপাধ্যায়ের মনে সেই তরঙ্গ আছড়ে পড়ছিল।

ছোটবেলা থেকে কোনওদিন ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে ছিলেন না ঊষা। শেষদিন রাতে স্বামীর সেই নিদারুণ মনোকষ্ট আজও তাঁর বুকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। এখন আমি কী বরবো? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নটি তাঁর মন থেকে উদয় হয়ে তাঁর অপর সত্তাকে সমানে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছিল এই ক'দিন।

কিন্তু গত সন্ধ্যায় সার্ভে অফিসারের লোভাতুর চোখ তাঁকে নির্দিষ্ট পথরেখা খুঁজতে কয়েক কদম এগিয়ে দিলো। 'ওরা আমার স্বামীর মৃত্যুর বিনিময়ে আমাকে সুখের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আমাকে কম্পেনসেশনের নাম করে ঘুষ দিতে চাইছে। ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেবার নাম করে কদর্য ইঙ্গিত করেছে। ওরা ঊষা উপাধ্যায়কে চেনে না।'

পরের দিনও বাগডিগি খনিপিটের চারপাশে হাজার শ্রমিক, নারী-শিশুদের জমায়েত জমাট আকার নিয়েছিল। বিক্ষোভে উত্তাল চারধার।

সেই রৌদ্রতপ্ত দিনে ঊষা উপাধ্যায় ঘর থেকে পথে পা রাখলেন।

বাগডিগি খনির মাইনিং সর্দার জীবন বেসরা ম্যানেজারের বউকে দেখেই ছুটে এলো।

ভাবিজী, কুথায় যাবেন?

তোমাদের কাছে এলাম।

হাম্যাদের কাছ্যে বটে?

হ্যাঁ, তোমাদের কাছে।

নিপাট, নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর। জীবন বেসরা উপাধ্যায়-ভাবিজীর দিকে অপলক তাকিয়ে রইল।

খয়েরি পাড়, সাদা শাড়ি। পায়ে কালো চটি। শরীরের কোথাও অলঙ্কারের সামান্যতম চিহ্ন নেই। অগণিত জনতা দেখলো, তবুও তাঁর মধ্যে আগুনের হল্‌কা।

আরও দু'একজন তাঁর কাছে এগিয়ে এলো।

ভাবিজী আপ--

হ্যাঁ। যাঁরা সেদিন মারা গেছে, ওদের বাবা-মা, বৌ-বাচ্চারা কোথায় আছে?

ওই যে, হেডগিয়ারের ডানদিকে বটগাছের নিচে বিক্ষোভ অবস্থান করছে।

আমি ওদের ওখানেই যাবো।

কেনে ভাবিজী?

আমারও তো স্বামী মারা গেছে। আমি ওদের ওখানেই বসবো।

একটু থতমত খেয়ে গেল জীবন বেসরা, লালজী ছেত্রী, নারান বাদ্যকররা।

লেকিন—

কিসের লেকিন? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো!

ওদের মনের মধ্যেও তোলপাড় হচ্ছিল। জীবন হাঁটতে শুরু করেছে। তারপর উষাদেবী। তারপর লালজী, রফিকুল, নারান, প্রীতম সিং, জগৎ এবং আরও—আরও অনেকে।

একটু টলমল করছিলো উষাদেবীর পা'দুটো। এই প্রথম তিনি রুক্ষ্ম পাথুরে মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। হেঁটে চলেছেন ওদের দিকে।

মৃত শৈল বাউরি, দীনু দফাদার, প্রশান্ত হেমব্রম, কৈলাস পাশোয়ানদের মা-বাবা, বৌ-বাচ্চারা বসে আছে। সেখানেই বসলেন মৃত অলোক উপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী উষা উপাধ্যায়।

হঠাৎ কেমন একটা নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে চরাচরে। হয়তো তা আগামী ঝড়েরই পূর্বাভাস।

মরদ

মাদল বাজছিলো। কাঠিনাচ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে আদিবাসী মানুষগুলো একসঙ্গে হৈ-হৈ করে উঠছিল। এখানে নারী-পুরুষ সবাই আছে। উদ্দাম নাচছে কেউ কেউ জোড়ায়-জোড়ায়। সম্মিলিত এই নাচ গান মালভূমির সরিষাথলি জঙ্গলের মহুয়া, শাল, কেঁদ, জাম—এসব গাছের মধ্যে এনে দিচ্ছিলো প্রাণ। মৃদু হাওয়ায় দুলতে দুলতে বৃক্ষরাজিও যেন তালে তাল দিয়ে যাচ্ছিল শ্রমিক নারী-পুরুষের গানের সঙ্গে—

'.........বছর বছর আসব গলা
আমরা তুমার ঘরে
খৈ খাব পিঠা খাব
পরতে একঠো পিড়ান লিব
কাঠি লাচায়ে মজা উড়াব
পয়সা দিও পরে।
বছর বছর আসব গলা
আমরা তুমার ঘরে রে
আমরা তুমার ঘরে.........।'

হে-রে-রে-রে,-রেরে, হে-রে রেরে-রেরে—ধিনা তা—ধিনা তা, ধা-ধিনা তা!

হাঁ রে হেই লখাই! কামে যাবিক লাই-ই-ই-ই রে!

যাবক বটে। আর দু' গেলাস মহুল খাব। জমবে লিশা। তবে কামকে যাব। হে-রে রে-রে, হে-রে রেরে। ধিনা-তা, ধা-ধিনা-তা!

এমন উদ্দাম নাচের সঙ্গে রাতের প্রহরগুলি এগিয়ে চলে। বসস্থলীর মাথায় চাঁদ হাসে। গাছের সবুজ পাতারা খুশি হয়ে বাতাসের সঙ্গে প্রণয়খেলায় মেতে যায়। দিলীপ বাউড়ির মন ভারী উচাটন হয়। 'লতুন বউ সনঁঝা যে ঘরতে এক্যা বটে।'

দিলীপ নাচ-গানের হুল্লোড় থেকে বেরিয়ে ধাওড়ার পথে হাঁটে। অনেকটা পথ। তারপর ওদের ধাওড়া। ধাওড়ার দরজায় টোকা দিল দিলীপ। দরজা খুললো সলাজ মুখে নতুন বউ।

মুনে হল্যো বটে ঘরের কথা?

কুথাকে যাবক ই ধাওড়া ছেঁড়ো? ঘরকে হামার তুহার মতো বিবি!

লাচ-গানে তো তুহার পেয়ার বটে!

না মাইরী। সনঁঝা, তু তো হামার জান সে জাদা।

হাজারিবাগ থেকে বীরভূম, ছোটনাগপুর মালভূমির এই পাথর মেশানো মাটিতে যেটুকু ধান হয়, তা রোঁয়া হয়ে গেছে ভাদ্রমাসে। নিড়ানি পড়েছে এক দফা। আশ্বিন-কার্তিকে সবুজ ধানগাছে শিস আছে। শিসের মাথায় মাথায় কচি ধানের ভেতর দুধ জমতে থাকে। চাষী খেতমজুরদের এখন কাজ নেই। ওরা তাই সন্ধে থেকে নাচ-গানে মেতে ওঠে। মহুয়ার মাতাল গন্ধ রাতভর গৌরাংডির বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নিশিরাতে দিলীপ বাউড়ীর মরদ শরীর নতুন বউয়ের নরম হাতে বাঁধা পড়ে। নাগ-নাগিনীর শঙ্খ-লাগা রাতের ওপর দ্বাদশীর চাঁদ হাসতে হাসতে কলস উপুড় করে জ্যোৎস্না ঢেলে দেয়। সেই জ্যোৎস্না মানবী শরীরে ঢেউ তোলে। .... রাত ফুরোতে থাকে .... রাত ফুরোতে থাকে .... ফুরোতেই থাকে রাত্রি।

দিলীপের মর্ণিং ডিউটি। গৌরাংডি ওপেনকাস্ট কয়লাখনির ডাম্পার অপারেটর সে। অভ্যেসের নিয়মে ঘুম ভেঙে গেছে দিলীপের। সে বউকে ঠেলা মারে।

হাঁ বউ! উট্‌ঠে পড় বটে! ডিউটি যাবক লাই হামি?

ভরা সুখের শিকল কেটে বিছানা থেকে উঠে পড়ে সন্ধ্যা।

শ্রমিক ধাওড়ায় ওদের দুটো খুপরি ঘর। এক চিলতে রান্নার জায়গা। কেরোসিন স্টোভ জেলে আটার মোটা মোটা রুটি বানালো সন্ধ্যা। আলু-পটলের তরকারি

করলো। আর তেজপাতা দিয়ে চা। সাড়ে সাতটার শিফ্‌ট ধরতে হবে। খেয়েদেয়ে জামা-প্যান্ট পরে তৈরি দিলীপ বাউড়ি।

যখন ধাওড়া থেকে চত্বরে পা রাখলো দিলীপ, তখন সন্ধ্যা ঘরের দাওয়ায দাঁড়িয়ে। দিলীপ হাত নাড়লো। সন্ধ্যা নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলো—

জলদি ঘরকে, আসবি বটে! আড্ডা জমাবিক লাই মহল্লায়!

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ডাম্পার অপারেটর দিলীপ দৌড়লো খনির দিকে। ঠিক টাইমে শিফ্‌ট ধরতে হবে যে!

দুই

গৌরাংডি অঞ্চল। বিশাল কয়লা খাদ। খাদের একেবারে নিচে থেকে গড়ানো রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। দু'ধারে খাদ। মাঝে রাস্তা। এই বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টন কয়লা বোঝাই ডাম্পার চালিয়ে ওপরে নিয়ে আসে মরদকা বাচ্চা মরদ দিলীপ বাউড়ী। ভয়-ডর নেই। খাটতে ভয় পায় না। কাজপাগল দিলীপ মহা আনন্দে ডাম্পার চালায়। অমন মিষ্টি বউয়ের কথা মনে পড়লেই কাজের গতি বেড়ে যায় তার।

স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে গুন্‌-গুন্‌ করে গান গায় সে—'খৈ খাব, পিঠা খাব/পরতে একঠো পিড়ান লিব/কাঠি লাচায়ে মজা উড়াব/আমরা তুমার ঘরে রে/পরতে একঠো পিড়ান লিব/কাঠি লাচায়ে মজা উড়াব/আমরা তুমার ঘরে রে/আমরা তুমার ঘরে রে/আমরা তুমার ঘরে...।'

এক ট্রিপ মাল ওপরে তুলে খালাস করে নিচে নেমে এসেছে দিলীপ। কালো হিরে লোডিং হচ্ছিল ডাম্পারে।—'হেঁইয়ো রে মারো—হেঁইয়ো! কাম কে ওয়াস্তে আওর কেয়া হ্যায় ভাইয়ো।'—গাঁইতি-বেলচাব খচাখচ্‌ শব্দ। কয়েকশো খনি শ্রমিকের কথাবার্তা আর কয়লা কাটার শব্দে এই খোলামুখ খনি গমগম্‌ করছে।

আরে এ দিলীপ ভাই-ই! গাড়ি তো লোড হো গিয়া রে-এ-এ-এ-এ!

বহোৎ আচ্ছা!

খোশগল্প ছেড়ে দিলীপ বাউড়ি একটা বিড়ি ধরালো। উঠে পড়লো চালকের কেবিনে। স্টার্ট হলো ডাম্পারের মোটর। একটু পিছিয়ে ডাম্পার তার নিজস্ব রুট ধরলো। গাড়ি উঠছে ওপরে। কিন্তু ইঞ্জিন বোধহয় ঠিকমতো কাজ করছে না। গিয়ার পালটে দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ওপরে উঠছে দিলীপ। কোথায় বুঝি গণ্ডগোল হচ্ছে! স্টিয়ারিংয়ের ওপর দিলীপের পেশিবহুল হাত সাঁড়াশির মতো আটকে আছে।

থোড়ি কেয়ার!—এরকম অনেক ঝামেলা সে সামলেছে এর আগে। মেশিনকে

কব্জা করার মন্ত্র তার জানা আছে।

টপ গিয়ারে গাড়ি ওপরে উঠছে। ডাম্পার এখন ওপর আর নিচের মাঝামাঝি জায়গায়। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ টন কয়লা পেটের ভেতর নিয়ে ডাম্পার এবার সত্যিই বেঁকে বসলো। হঠাৎই থমকে গেলো গাড়ি। দিলীপের ঠাণ্ডা মাথা। ঘাবড়ে গেলে কেলেঙ্কারি। ডাম্পার পেছনে চলতে চায়। একটু একটু করে ব্রেক চাপে দিলীপ। দু'একবার ব্রেক কাজ করলেও মনে হচ্ছে ব্রেকও কাজ করতে চাইছে না।

ঘাবড়াবে না অভিজ্ঞ দিলীপ। এই হলো তাঁর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সে তা হলে কী করবে? গাড়ি পেছনে গড়াতে শুরু করেছে। ব্রেক এখন একটুও কাজ করছে না।

ই ডাম্পার রুখতেই হবে বটে!—দিলীপ বাউড়ি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। গিয়ার, ব্রেক সবকিছুই দ্রুত একবার দেখে নিল। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গাড়ি পেছনে গড়িয়েই চলেছে। সব চেষ্টা বৃথা। এবার পেছনে সামান্য বাঁক। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁক কাটালো সে। এবার পেছনে একেবারে সোজা গড়ানো রাস্তা।

হা ভগমান! ই গাড়ি থামবেক লাই বটে! কুনো মিশিন ভি চলছেক লাই! দিলীপের নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে—ইটা কি কঁইরল্যে বটে ভগমান! হাম্যাকে হাঁরাই দিল্যে!

পঁয়তাল্লিশ টন কয়লা নিয়ে বিকল ডাম্পার পেছনে ছুটছে...ছোটার গতি ক্রমশ বাড়ছে...বেড়ে যাচ্ছে...বাধাহীন গড়ানো রাস্তায় তার পেছনে ছোটা কিছুতেই আটকাতে পারছে না ঝানু অপারেটার দিলীপ। শুধু স্টিয়ারিং ধরে সরাসরি নিচে নামলে সামান্য ক্ষতি হলেও ডাম্পার বাঁচানো সম্ভব।—ভাবছিল দিলীপ। কিন্তু পেছন ফিরে, গ্লাসে চোখ রেখে আঁতকে উঠলো সে।

সর্বনাশ!—গড়ানো রাস্তার শেষ প্রান্তে শ-দেড়েক শ্রমিক কাজের জন্য জড়ো হয়েছে। ওরা বুঝতেও পারছে না, ওপর থেকে নিঃশব্দে ছুটে আসছে ভারী ডাম্পার। মুহূর্তের মধ্যে সেটা ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কি করব্যক বটে? হাঁই ভগমান! কুছ তো বাতাও! কেয়া করু?

এক্ষুনি ভাবনা, এক্ষুনি সিদ্ধান্ত। এক্ষুনি কাজ। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে গভীর কয়লা খাদ। দিলীপ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। শুধু মনে মনে সে একবার বললো, 'সনঝাঁ, তুয়ার কাছে মাপ চাইল্যম বটে।'

এবার সে দ্রুত ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলো। পঁয়তাল্লিশ টন কয়লাবোঝাই ভারী ডাম্পার ডানদিকে শূন্যে ঝুলে পড়লো। পশ্চাৎগতির প্রবল টানে বিকট শব্দে দ্রুতপতন ঘটলো খাদে।

নিকষ কালো কয়লাখাদে ডাম্পারের নিচে সম্পূর্ণ পিশে গেল দিলীপ বাউড়ির শরীর। সাঙ্ঘাতিক কোলাহল উঠলো তখন গোরাংডির খোলামুখ কয়লাখনিতে।

তিন

ঝড়!...প্রবল ঝড় উঠলো সেদিন বিকেলবেলা। মালভূমির মাঠ-ঘাট-ধাওড়া আর খনিতে উড়তে ল্যাগলো শুকনো ধুলো। প্রকৃতি যেন হঠাৎই খেপে উঠছে। সরিষাথলি বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি প্রবলবেগে মাথা নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওরা যেন এই কথাই বলতে চায়—না, না, না! এমনটি হবার নয়! এ যে বড়ো দুঃখের। বড়ো কষ্টের।

গৌরাংডির খোলামুখ খাদান থেকে ঘূর্ণির মতো পাক খেতে খেতে উঠছিলো কালো হিরের গুঁড়ো। কয়লা খাদ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেই কালো ধুলোরাশি বাতাসের শরীরে ভর করে উড়ে যাচ্ছে শ্রমিক-বস্তির দিকে। সেখানে রোজকার মতো রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছে দিলীপের বউ সন্ধ্যা বাউড়ি। সেই কালো ধুলোর ঝড় শ্রমিক বস্তিকে অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে। ধাওড়ার পাশে নিমগাছ আর অশ্বত্থগাছটা যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

এমন ঝড় এই যুবতী বয়স পর্যন্ত কোনোদিন দেখেনি সন্ধ্যা। চিন্তিত মুখে সে নিজের মনেই বলছিলো, পিথীমিটা ভারী গোঁস্‌সা কইরেছ্য বটে! হামার মন কেনে ভার হঁইয়ে যেচ্ছে? কেনে?

সেই শুকনো ঘূর্ণিবাতাসের সঙ্গে বহুদূর থেকে একটা পুরুষকণ্ঠের ডাক ভেসে আসছিল। প্রথমে সন্ধ্যা বোঝেনি। ঝড়ের শব্দের মধ্যে সেই ডাক চাপা পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু এখন তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

সন্‌ঝা-আ-আ-আ-আ! আরে হেঁই সন্‌জা—'আ-আ-আ-আ!

হামাকে ডাকছো বটে!

প্রথমে সে ভেবেছিলো, বুঝি ওর মরদ দিলীপই ডাকছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো।

এ অন্য কারোর গলা। এ শুধু এক জনের গলা নয়। কয়েকজনের গলা।

এ সন্‌ঝা-আ-আ-আ-আ! সন্‌ঝা রে-এ-এ-এ-এ!

ধুলোর ঝড়ের মধ্যেও কারা যেন তাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে।

হাম্যাকে ডাকছে কেনে বটে!

সন্ধ্যা ঘর থেকে বাইরে নামলো। মনে হচ্ছে ঝড় অনেকটাই কমে এসেছে। গাছপালার মাথা নাড়ানাড়ি কমে গেছে। ঘাড় উঁচু করে সামনের রাস্তার দিকে তাকাতেই সে দেখলো, মালভূমির অসমান্তরাল রাস্তার আড়াল থেকে ঢালের মাথায় দু'জন মানুষ। ওরা ছুটে আসছে।

সন্‌ঝা-আ-আ-আ-আ!

কেনে গো-ও-ও-ও-ও! সন্ধ্যা এবার সাড়া দিলো।

মানুষদু'টো কাছে চলে এসেছে। খনিতে কাজ করতে করতেই উঠে এসেছে ওরা। ওদের গায়ে কাজের পোশাক। সন্ধ্যার কাছে এসে ওরা দাঁড়ালো। ওরা হাঁপাচ্ছিলো।

কি হইঁয়েছে বটে?

একসিডেন। দিলীপের একসিডেন হইঁয়েছে। তু চল্ জলদি!

হা মাইয়া! উয়ার একসিডেন হইঁয়েছে! কুথ্যাকে?

খাদানে।

হায়া সব্বনাশ!—বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো সন্ধ্যার। ওর শরীর মন উথাল-পাথাল করছে। ও রাস্তায় নেমে পড়লো। তারপরই ছুটতে শুরু করে দিলো। খনির দিকে।

সন্ঝাঁ! ডাঁড়া। হামিলোগ যাব্য বটে!

আর কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না সন্ধ্যা বাউড়ি। সে ছুটছে। পেছনে পড়ে রইলো তার অর্গলমুক্ত ঘর। স্তিমিত ধুলোর ঝড় কেটে কেটে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সন্ধ্যা। বিড়বিড় করে সে বলে চলেছে—হাম্যার মরদ! হাম্যার মরদ!

সন্ধ্যার হুঁশ নেই। পেছনে ছুটছে সেই দু'জন মানুষ। বিস্রস্তবাস সন্ধ্যার শাড়ির আঁচল উড়ছে পেছনে। যেন পাথরে খোদাই করা নারীমূর্তি উড়ে চলেছে আকাশ পথে।

ঝড় বুঝি এখন উল্টোপথে। ছুটন্ত সন্ধ্যা বুঝি বা ঝড়ের গতিকে ধাওড়া থেকে খনিমুখি করে নিয়েছে।

উচ্চাবচ মালভূমির ঢাল-নাবাল রাস্তা ধরে সেই নারী ছুটছিল তার আপনজনের কাছে। ক্লান্তি নেই। কোনো হুঁশ নেই। কারণ, সে তার মরদের কাছেই তো যাচ্ছে।

ঝড় নেই এখন। কিন্তু এখন ঝোড়ো নারীসত্তা ছুটছিল তখনো।

অবশেষে সে পৌঁছে গৌরাংডির সেই খোলামুখ খনির কাছে।

মানুষে মানুষে ছয়লাপ। সবাই সন্ধ্যাকে জায়গা করে দিল। যে-আশঙ্কা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে এখানে, তাই দেখলো এসে।

এখনো হাসছে দিলীপ বাউড়ি। তাঁর থ্যাঁতলানো দেহটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাঁরই শরীরের রক্তে তা লাল হয়ে উঠেছে।

সেই শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সন্ধ্যা।

চার

কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে আসছে এখানে।...'দিলীপ বাউড়ি নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে অনেক শ্রমিক ভাইয়ের প্রাণ।'—এই কথা ভেবে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

...কাঁদতে কাঁদতে সন্ধ্যার চোখের সামনে থেকে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। ...ভেসে ওঠে দিলীপ বাউড়ির হাসি মুখ। দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরা। ফুলে উঠেছে তাঁর পেশিগুলো।...পৌষ মাসে ধান কাটা শেষ হয়ে যাবে জমিতে। খাটাখাটনির পর আবার চাষীদের ফুরসত মিলবে।

'সন্ঝা, মকর সংক্রান্তিতে তুক্যে লিয়ে লাচব বটে।'—লজ্জা পেয়ে সন্ধ্যা বলেছিলো, 'ধ্যাৎ! শরম লাই বটে হাম্যার?'

হো-হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সন্ধ্যাকে চেপে ধরে দিলীপ গান ধরেছিলো—

'আসছ্যে মকর
দু'দিন সবুর কর
তরা বাঁকা পিঠ্যার জোগাড় কর রে
তরা বাঁকা পিঠ্যার
জোগাড় কর...।'

তেমনি হাসি মুখ করে দিলীপ এখন শুয়ে আছে। যেন বলতে চাইছে—'তু বাঁকা পিঠা তৈয়ার করব্যি বটে সন্ঝা, ইব্যারের মকরে।'

...কোলাহল বাড়তে থাকে। সন্ধ্যার চমক ভেঙে যায়।

বুকভরা খাঁ-খাঁ শূন্যতা। কানে আসে বহু মানুষের কথা—'দিলীপ ভাই, জিতা রহো। মরদ কা মাফিক জান দে দিয়া দিলীপ ভাই!' বৃদ্ধ ভজন বেসরা, রামদুলারি, ইন্দুমতি সন্ধ্যাকে ধরে তোলে।

বলে, সনঝাঁ, তেরি মরদ মরদকা মাফিক চলা গিয়া। দুখ তো হ্যায়ই, লেকিন গরব জরুর হ্যাঁয়।

হাঁ বিটি, ডেঁড়শও লেবরকো দিলীপ ভাই জান সে বাঁচা দিয়া। নেহি তো আভি উসিকে বঁহু, উসিকো লেড়কা-লেড়কিলোগ ইঁহা পর রো রো-কে মর যাতা।

হাঁ সন্ঝাঁ ভাবী, দিলীপ উসকা ডাম্পার ডাইনা খাদমে গিরা দিয়া। নেহি তো ডেঁড়শও আদমীকে মওথ হো যাতা।

সন্ধ্যা আর কাঁদতে পারছে না। গলা ভেঙে গেছে তার। দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়াচ্ছে।...চারদিকে কোলাহল। শুধু দিলীপের প্রশংসা আর প্রশংসা।

সন্‌ঝাঁ, চল্‌ তো আভি।

কুথ্যাকে যাব?

হাজারো লোগ দিলীপকা সাথ যায়েগা। তুঝকো ভি যানে পড়েগা।

সন্ধ্যা দেখলো, তার স্বামীকে নিয়ে শ্মশানে. যাবার জন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ।

চল্‌ সন্‌ঝাঁ, চল্‌।

সন্ধ্যা বাউড়ি ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে।

রামদুলারি ওদের ধাওড়ার সীতারাম সিংয়ের বউ। সাচ্চা আদমী ছিল্য বটে তুয়ার মরদ।—বললো রামদুলারি।

হাঁ, মরদকা মাফিক চলা গিয়া আসমানমে। ভজন বেসরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সন্ধ্যা হাঁটে। ক্রমশ সন্ধ্যার পদক্ষেপ দৃঢ় হয়। ওর চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ে।

নিজেকে সামলায় সন্ধ্যা। স্বামীর জন্য গর্ব হয়। মরদের মতো মরেছে তার মরদ। মরেও হাসি মুখ। ভয় পায়নি সে।

হাজার হাজার মানুষ হাঁটছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে গৌরাংডি ওপেন কাস্ট মাইনের সুদক্ষ ডাম্পার অপারেটার দিলীপ বাউড়ি। যাবার আগে দিলীপ এই সমস্ত মানুষগুলোকে বেঁধে ফেলেছে তাঁর ভালোবাসার বাঁধনে। সন্ধ্যা ক্রমশ বুঝতে পারছিল এই সত্যিটা।

সন্ধ্যা বাউড়ি চলতে থাকে। তার হাঁটা আরো দৃঢ়তর হয়।

পুরনো পৃথিবীর মানুষ

অজয় নদের পাড়েই সে গ্রাম। নাম লখনডাঙা। বিষণ মাঝি এই গ্রামেই থাকে। রাঢ় বাংলার আদিবাসী জনপদ লখনডাঙার চারদিকে পাথুরে চড়াই-উৎরাই জমি। দূরে দূরে পাহাড়। অরণ্যে শাল, পলাশ, মহুয়া, শিমূল। বর্ষায় অজয় উত্তাল। শীতে গ্রীষ্মে সেখানে শুকনো বালি।

তবু সেই রুক্ষতার মধ্যে লখনডাঙা যেন প্রবাল দ্বীপের মতো। নির্জন সবুজের দেশ। গ্রামের মধ্যে বড় বড় শিরীষ, শিমূল, আম, শাল-সেগুন ছায়া বিস্তার করে আছে। মাটির অনেক গভীরে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে বেশ কিছু অশ্বত্থ, বট।

এমন সুন্দর গ্রাম লখনডাঙা। সেই গ্রামে থাকে প্রবীণ বিষণ মাঝি। অদ্ভুত সেই মানুষ। কত কাহিনি তাঁর ঝুলিতে। যেমন কয়লাখনি এলাকা।

কত রকমেব মানুষ যে পেটের টানে এখানে এসেছে, তার লেখাজোকা নেই। তেমনই বিষণ মাঝির ঝুলিতে আছে হাজারো কাহিনি।

হাঁ হাঁ ভাই! আজ সে ডেঁড় শও বচ্ছর হো গিয়া। লখ্যন মাঝি ইঁহা পর

চলা আয়া ভগনাডিহিসে।

সিদো-কানহুকে সাথ সাথ লখন মাঝি ভি খুব লড়াই দিল্য বটে বৃটিশদের সাথ?

হাঁ, হাঁ। সহি বাত! সাহেবদের হাথ্যে বন্দুক। সাস্তাললোগের তীর ধনুক। যাদা লড়াই হল্যো। বহুৎ মরে গেল্য সাঁওতাল আদমীলোগ। বহুৎ মরল্য বটে। বহুৎ! রক্তে ভাঁইস্যে গেল্য সাঁওতাল পরগণা।

এইসব কথা শুনতে শুনতে রতন মাঝি, গরিব মুন্ডা, সহিস বেসরাদের শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সিদো-কানহু-র নাম শুনলে ওদের বুকের ছাতি ফুটে ওঠে। গৌরাংডি হাইস্কুলের ইতিহাসের মাস্টার নয়নবাবুর কাছে ওরা শুনেছে, আঠারো শো পঞ্চান্ন সালের ত্রিশে জুন সাঁওতাল পরগণার ভগনাডিহিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আদিবাসী সাঁওতালরা। নেতৃত্ব দেয় সিদো-কানহু। ইংরেজদের বন্দুকধারী শিক্ষিত সেনাদলের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করল সাঁওতালরা। বীরের মতো মরল তাঁরা হাজারে হাজারে। সেই সালের চব্বিশে জুলাই ইংরেজরা সিদো-কানহুর ফাঁসি দেয়।

চোখে ঘোর লেগে যায় বৃদ্ধ বিষণ মাঝির। ঘোর লাগে যুবক সনাতন মুর্মুর। আসলে লখনডাঙা গ্রামের সঙ্গে সেই বিদ্রোহের নাড়ির যোগ আছে যে।

বুল্য না হে সি সব দিনগুলার কথ্যা!

বিষণ মাঝির কাছ থেকে সনাতনরা জানতে চায় সব।

লখ্যন মাঝি ভি ছিল্য সি লড়াইয়ে। খুব লড়ল বটে। সিদো কানহু ধরা পইড়ল্য। লখ্যন মাঝি পঁলাই গেল দুমকা জিলা থিক্যে। ছুপাল ইখানে। আর বহুৎ সাঁওতাল আইল্য ই বসতিতে। উয়াদের লিডারের নামে ই গেরাম হল্য লখ্যনডাঙা। লখ্যন মাঝি হামার দাদ্যু বটে।

এইসব নানা সুখ আর যন্ত্রণার স্মৃতিগুলো বুকের মধ্যে রেখে দিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এল বিষণ মাঝি। বয়স তিন কুড়ি পনের। বীর সাঁওতাল লখন মাঝির নাতি। কয়লা খাদানে কাজ করত। এখন অবসরে। পেনসন পায়। ধাওড়ায় থাকে। বিয়ে করেনি। ত্রিভুবনে কেউ নেই। শুধু আছে নানা কথা। অনেক কাহিনি।

বয়েসের তো ভার আছে! আর আছে স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে প্রতিদিন চলার ভার। জীবনের রূপোলি রোদ্দুরের দিনগুলো চলে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে ক্রমশ বিষণ মাঝির মনের মাঝখানটায়। তাই পড়ন্ত দিনমানে লখনডাঙার পশ্চিম সীমায় হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় সে। পশ্চিম দিগন্তে অজয়ের ওপারে, আরো দূরে অজস্র পাহাড়চুড়ো দেখা যায়। দিনশেষের রক্তি আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে দিতে দিতে পাহাড়ের ওপাশে সূর্য নামতে থাকে। সেই লালাভ আলো পড়ে লখনডাঙা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে

গাছগাছালির ওপর।

একটা বট, আর একটা অশ্বত্থ গাছ। দুই গাছের মধ্যিখানে তাঁদের মারাংবুরু ঠাকুরের থান। এখানে প্রতি অপরাহ্ণে রোজ আসে বৃদ্ধ বিষণ মাঝি। আদিবাসী দেবতা মারাং বুরুর এই থানকে সিনো-কানহুর থানও বলে অনেকে।

সেও এক কাহিনি। সে কাহিনিও গ্রামের মানুষ শুনেছে বিষণমাঝির কাছ থেকে। গ্রামের পশ্চিম সীমা পেরিয়ে বিরাট এক পাথুরে ঢিবি। সেই ঢিবির সামনেই আজ থেকে দেড়শো বছর আগে একটা বট আর একটা অশ্বত্থ গাছ লাগিয়ে ছিল লখন মাঝি। বটের নাম দিয়েছিল সিদো। অশ্বত্থের নাম কানহু। বিষণ মাঝির মতো লখনডাঙা গ্রামের প্রবীণরা তাই এ-জায়গাটাকে সিদো-কানহুর থানই বলে।

আজও সূর্য ডোবার সময় সিদো-কানহুর থানে এসেছে বিষণ মাঝি। সে এখানে এসে রোজ নির্জনে তাঁর পূর্বপুরুষের সঙ্গে কথা বলে।

আজকে কিন্তু জায়গাটা নির্জন নয়। অনেক অচেনা লোক হাঁটাচলা করছে। বিষণ মাঝি অবাক হয়। কয়লাখনির ব্যাপারে বিষণ মাঝিও অভিজ্ঞ। সে দেখল, বড় বড় শোভেল, ডাম্পার, ড্রোজার, ক্রেন আর বেশ কয়েকটা ট্রাক এসে হাজির গ্রামের পাশের বিশাল খালি জমিতে। এসব যন্ত্রপাতি তো খনির কাজেই লাগে। অনেক মানুষের হৈ-হল্লা, যন্ত্রের দাপাদাপিও চলছে। তাঁবু খাটিয়ে চার-পাঁচটা ছাউনিও তৈরি হয়েছে লোকজন থাকবার জন্য।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এসব দেখল সে। বুঝতে পারল, এখানে নতুন করে কয়লা কাটার কাজ শুরু হবে। জমি জরিপ চলছিল অনেকদিন ধরেই। সেটা বিষণ মাঝির জানাই ছিল। তবে এ-সব নিয়ে সে আর ভাবে না।

যন্ত্রের মতো চলতে থাকা এই পৃথিবীর সবকিছুই সে এড়িয়ে চলে। দিনভর রাতভর সে শুধুই ফেলে আসা দিনগুলোর জাবর কাটে। তাই আজও ওইসব লোকলস্করের দিকে সে আর তাকাল না। সিদো-কানহু নামের সেই বট-অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে রইল। দেখতে লাগল, সূর্য তাঁর রাতুল আভা দিগন্তজোড়া ছড়িয়ে দিয়ে আজকের দিনের শেষক্ষণটিকে কখন নিয়ে আসবে। আর তাঁর মনের অলিন্দে ভিড় করতে লাগল সেই সব ছবি। ভগনাডিহির শুষ্ক প্রান্তরে লড়াই চালাচ্ছে বীর সাঁওতালরা। হাতে তাঁদের তীর-ধনুক। ইংরেজদের সঙ্গে তুমুল লড়ছে সিদো-কানহু। লড়ছে লখন মাঝি।

সি সব দিনগুলান কুথ্যাকে গেল্য!—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনে মনেই একথা উচ্চারণ করল বিষণ মাঝি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে বসে থাকে বট-

অশ্বত্থের নিচে।

হঠাৎ তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে যায় তাঁর চোখ। চোখ খুলে সে কিছুই দেখতে পায় না। তারপরই ঘট্‌ঘট্‌ শোঁ-শোঁ শব্দ। তঠস্থ হয়ে উঠে পড়ে বিষণ মাঝি।

যা বাব্বা! হঠাৎ কি্য হল্যোল বটে?

পরমুহূর্তেই সে বুঝতে পারলো, এ হল শোভেল আর ড্রোজারের আওয়াজ। পাথুরে মাটি কাটা হচ্ছে। ড্রোজার দিয়ে সেই চাঙড়গুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে দূরে। বিষণ মাঝি চোখ ধাঁধানো আলোর বৃত্ত থেকে সরে আসবার জন্য সামনের দিকে হাঁটা দেয়।

আরে আরে! হেঁই বুঢ়া! মরবে নাকি? শোভেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে!

থমকে দাঁড়ায় বিষণ মাঝি।

আমাদের বিষণ মাঝি না?

চেনা গলা। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার অবনী সেন। তাঁর চাকরির শেষ বছরে অবনী সেই খনিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছিল।

অবনীবাবু বট্যে?

খুড়ো, তুমি কি করছো এখানে?

হামার লখ্যন দাদুর সিদো-কানহুর থানে বঁইস্যে আছি বটে।

কেন গো খুড়ো?

কি করব্যো বুল্য! বুড়া হঁঞি যেঁনছি। হাম্যার সিদো-কানহু ছাড়া কুথ্যাকে আর কুছু লাই।

কোথায় তোমার সিদো-কানহু?

তর্জনী তুলে সেই বিরাট বট আর অশ্বত্থকে দেখিয়ে দেয় বিষণ মাঝি। বলে, হামার দাদ্যু লখ্যন মাঝি, লাগাঁইনছিল্য ই গাছদুটি। উয়াদের নাম সিদো-কানহু।

বলো কি! এই গাছ দু'টোই তো আজ রাতে আমরা তুলে ফেলবো!

কেন্যে গো? অবনীবাবু! কেনে, কেনে?

বুক ফাটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে বৃদ্ধ বিষণ মাঝি।

অবনী সেন বিষণ খুড়োর এমনধারা প্রতিক্রিয়ায় থতমত খেয়ে যায়। সে এগিয়ে আসে। বৃদ্ধের হাত ধরে সার্চলাইটের আলোর বৃত্তের বাইরে নিয়ে যায়।

তুমিও তো কোল মাইন্‌সের মানুষ। তাই না খুঁড়ো?

হাঁ। তা বট্যে। লেকিন হাম্যাদের সিদো-কানহু কি কসুর করল?

কেউ কোনো কসুর করেনি। লখনডাঙার গা ঘেঁষে জমি জরিপ হল। তুমি তো জান?

হাঁ, জরুর।

তা হলে? এই গ্রামের গা ঘেঁষে ওপেন কাস্ট মাইন হবে। খোলা খাদান। এখানে মাটির নিচে অনেক কয়লা আছে। এই গাছ দুটো কাটা যাবেই।

হাম্যদের সিদো-কানহুক্যে বাদ দিইয়ে খাদ কাট্য।

তা হয় না। এ সরকারি হুকুম। দু'দিন বাদে লখনডাঙা গ্রামের মানুষজনকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে পুরো গ্রামটাই খোলামুখ খাদান করা হবে। এর নিচে যে প্রচুর ভালো কয়লা আছে।

হাম্যদের সিদো কানহুকে উপড়াই দিব্যে?

দিতেই হবে বিষণখুড়ো। তুমি কি চাও না, আরো একটা বিশাল খোলামুখ খাদান হোক? অনেক মানুষ চাকরি পাক?

দারুণ দুঃখে বুক ভেঙে যেতে চাইছে বিষণ মাঝির। তবুও সে বললো, হাঁ, হাঁ। সভি লোগের নোকরি হো যায়ে তো আচ্ছা। সব লোগ আচ্ছা রহো ভাই!

এই জগৎটার ওপব প্রবল অভিমান নিয়ে বিষণ মাঝি উচ্চারণ করল কথা ক'টা।

তখন দানবিক যন্ত্রগুলো পাথুরে মাটি ফাটিয়ে কেটে চৌচির করে দিচ্ছিলো। বিকট শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল রাতের অন্ধকার মাখানো মালভূমির বিস্তৃত প্রান্তরে। মাটির চাঙড়গুলো ডাম্পারে ভর্তি করে দূরে জমা করা হচ্ছিল।

মারাংবুরুর থান থেকে একটু দূরে চুপচাপ বসে রইলো বিষণ মাঝি। অন্ধকারে। রাত্রি আরো গভীর হচ্ছিল। যন্ত্রের দাপটে টুটাফাটা হয়ে যাচ্ছিল মাটি পাথর। যান্ত্রিক শব্দ তুলে দানবাকার শোভেলটি সেই বট অশ্বত্থের কাছেই মাটিতে ঘা মারতে শুরু করেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে বিষণ মাঝির সিদো-কানহু।

নির্লিপ্ত উদাস বিষণ মাঝির চোখ দুটো। দৃষ্টি চলে গেছে কত দূরে কে জানে! এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল।

বটগাছটা এতক্ষণে শোভেলের ধাক্কায় প্রবল ভাবে নড়ে উঠল। বিড়বিড় করে কি সব বলে চলেছে বিষণ মাঝি? তাঁর দু'চোখ গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। এক সময় হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল বট গাছ।

হাঁই আম্যার সিদো রে-এ-এ! বলে বুক চাপড়ে তীব্র চিৎকার করে উঠল বিষণ মাঝি। শোভেল, ড্রোজার আর ডাম্পারের গর্জনে চাপা পড়ে গেল তাঁর চিৎকার। শোভেল এবার অশ্বত্থ গাছের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে।

আর বসে থাকতে পারলো না বৃদ্ধ বিষণ মাঝি। উঠে পড়ল। তাঁর পা টলছে।

টলায়মান শরীর নিয়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে সে প্রগাঢ় অন্ধকারে মালভূমির প্রান্তরে পা রাখলো।

বিষণ মাঝি ছুটছে। অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছে। শোভেল, ডাম্পার আর ক্রেনগুলো প্রবল শব্দে যেন হা-হা করে অট্টহাসি হাসছে। এদিকে প্রবীণ সাঁওতাল বিষণ মাঝি বুঝিবা ফিরে চলল পুরোনো পৃথিবীর দিকে।

লখনডাঙা গ্রামে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না অতীত কাহিনির এই মানুষটাকে।

রাঙা বউ

রাঙা বাগদিকে সবাই বলে রাঙা বউ। কারণ সে যে কালোবরণ কন্যা। রুক্ষ্মভূমে বন্দী যেন কোন বনরাজ্যের মেয়ে। আহা, এ শরীর, শরীর তো নয়, পাথর ছেনে গড়া যুবতী। ভাঁজে ভাঁজে স্বপ্ন টানে। এমনই মেয়ে। এমনই হলো সেই রাঙা বউ। কালো হিরের গ্রাম, আর কালো হিরের এ রাস্তায় এমন কালো বউ মানায় ভালো। সব ঠিকই আছে। কিন্তু সেই হলো সবার কাছে রাঙা বউ। কালো বউ মোটেই নয়। রাঙা বাগদি, সে থেকে রাংগি। শেষ পর্যন্ত সবাই রাঙা বউকেই মেনে নিলো। বউয়ের তাতে ওজর আপত্তি নেই। সবেতেই হাসিখুশি ছিলো সে। স্বামীর ঘর, সেই ঘরই সব। সেই গ্রাম, সেই রাস্তা, তাও ভালো। কিন্তু স্বামী? তার মরদ? রাঙা বউ সেখানেই এসে ঠেকে গেলো। কারণ সে ঘটনা ঘন আঁধারের মতো ভারী কালো।

উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমিজমা, পাথুরে মাটি, আবার কোথাও মাটিতে খানিকটা চাষবাস। তার ফাঁকে ফাঁকে ঘর সংসার। দূরে দূরে যেন দ্বীপভূমির মতো গ্রাম। সে এক মন কেমন করা ধূ-ধূ প্রান্তর। এমন সে গ্রামে লালরঙিন রাস্তার পাশে খনি কোম্পনির হলুদরঙের কোয়ার্টার। কয়লাখনি মজদুরদের বাসভূমি। যাকে

বলে ধাওড়া। যেন পাখপাখালি থাকবার খোপ। তেমন ঘরেই শ্যামলাল বাগদি ও তার বউ থাকে। শ্যামলালের বউই রাঙা বাগদি বটে। সে রাঙা বউয়ের জীবন, যেন কালো কয়লার উনুনের গনগনে আঁচের মতো রাঙা, টকটকে লাল। প্রবল তার উত্তাপ। সেই উত্তাপে সে নিজেই পোড়ে? নাকি সবাই-ই পোড়ে?

ধাওড়া থেকে বেরিয়ে রাঙা বউ হাতে থলি নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলো। অনেকটা লাল ধুলোর পথ পেরিয়ে ছোটখাটো বাজার। আছে দু'চারটে সবজির দোকান। মাছের দোকানও আছে দু'একটা। রাঙা বউকেই বাজার করতে হয়। মরদ শ্যামলাল, সে কবেই বা সংসার দেখলো! তাই মাঝে মাঝে বাজারে আসে সে। আজ একটু আলু, একটু ঝিঙে, বেগুন আর ছোট্ট পোনা মাছ আড়াইশো গ্রামের মতো নিলো। নিয়ে সে যখন বাড়ির দিকে রওনা দিলো, তখন ন'টা বাজে। রাংগি মনে মনে বললো, অনেক বেলা হল্যো বটে। রাঁইধতে দেরি হঁইয়ে যাব্যেক। তাড়াতাড়ি পা চালালো বউ। রোদ্দুর প্রখর। খটখটে আকাশে সূর্য তেজের সঙ্গে তাপ ছড়াচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছিলো অজয় নদী। ওপারে আরো দূরে দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা গাদাগুচ্ছের পাহাড়।

প্রায় ছুটছিলো রাংগি। কপালে বিন-বিন ঘাম। রোদ্দুর মাখা রাংগির ফনফনে কালো শরীর থেকে সুস্বাদু আলো ঝরছিলো। সেই স্বাদু আলোর গন্ধ মিশছিলো বাতাসে।

ও রাঙা বউ-উ-উ-উ-উ! চইল্যে কুথা বটে!

যেখানে স্বাদ গন্ধ, সেখানে ভোমরার গুনগুনানি থাকবেই। বাংগি যা ভেবেছে তাই-ই। আট নম্বর পিটের হাজারিবাবু নকুল দত্ত। দূর রাস্তা থেকে হাত নেড়ে বলছে, রাঙা বউ, শুন্য বটে-এ-এ! ডেঁইরে যাও!

সুময় লাই বটে-এ-এ! ঘরকে কাম আছে। রাঁইনধতে হব্যে। ফালতু কথায় কাম লাই!

দাঁড়ালো না রাংগি। তরতরিয়ে চলে গেলো ওদের ধাওড়ার দিকে। দেখে ক্ষিপ্ত নকুল দত্ত গালাগাল দিতে লাগলো।

ঢেমনির খুব রস হঁইনছ্যে! শ্যামলালকে চার পাঁইট ধরিয়ে দিল্যে ঢেমনি সুড়সুড় কইরে চইলে আঁইসব্যাক।

নকুল দত্ত রাংগির ছমক ছমক হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে উন্মাদ হয়ে উঠছিলো। রাংগির গনগনে আঁচে পুড়তে পুড়তে নকুল দত্ত পাগলপারা হয়ে যায়।

রাংগিদের ধাওড়ার পাশেই একটা তেঁতুল, একটা শিমুল, আর একটা নিমগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। প্রখর রোদ্দুরে অনেকটা ছায়া এখানে। তার সঙ্গে শীতলতার ছোঁয়া। সেই ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলো সত্যম। সত্যম রুইদাস। ঝাঁকরা, চুল, কুচকুচে কালো চেহারা সত্যমের। উল্টোদিকে মুখ করে গুনগুন গানের সুর ভাঁজছিলো।

তাকে দেখে রাংগি দাঁড়ালো। এই রোদ্দুরে হেঁটে হাঁপিয়েও গিয়েছিলো রাংগি। একটু জিরোনোর জন্যও গাছতলায় থামলো সে। আনমনে গুনগুন করছিলো সত্যম। সে এরকমই। ভারী ভাবুক। গান গায়। কখনো সখনো বাঁশিও বাজায়। কয়লা খাদানের লেবার সে-ও। কম কথা বলে। কয়লার মতোই শক্ত, কয়লার মতোই কালো সত্যম রুইদাসের বড় বড় চোখ দু'টোয় এই মালভূমির, বনাঞ্চলের, আর অজয় তীরের গভীর-গোপন নৈঃশব্দ এবং বিরাটত্ব ফুটে ওঠে যেন। রাঙা বউ তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো চুপচাপ। কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল। তারপর কথা বললো রাংগি।

কি গান গাঁইনছো বটে? চমকে ঘুরে তাকিয়ে সত্যম দেখলো রাংগিকে।

রাঙা বউ! বাজার হঁল্য বটে?

হল্যঁ। ইবার রাঁইনধতে হব্যেক। যাই।

হাঁ, যাও।

একটু হাসলো সত্যম। সে হাসিতে বিষণ্ণতা ছিলো। এই বিষণ্ণতা দেখলে মন কেমন করে ওঠে। বোধহয় তাই কিছু বলতে চাইছিলো রাংগি। কিন্তু সত্যমের প্রবল ঔদাসীন্য রাংগিকে চুপ করিয়ে দিলো।

রাঙা বউ এক পা দু'পা করে চলে গেল ধাওড়ায়। তার ঘরে। মালভূমির পৃথিবী জুড়ে রইলো প্রখর রোদ। শব্দ নেই। ছিলো বিষণ্ণতা। সত্যম রুইদাসের চোখে সেই বিষণ্ণতার আলো খেলা করছিলো। বহু-বহুক্ষণ এভাবে আনমনা দাঁড়িয়ে থাকার পর চটকা ভাঙলো সত্যমের। ওর মনে হলো, তাই তো! রাঙা বউ দু'টো কথা বলতে চাইলো। আমি তো কিছুই বললাম না! এ ভারী খারাপ হলো।

এবার ধাওড়ার দিকে চললো সত্যম। ধাওড়ার শেষ মাথায় ওদের ঘর। সত্যম ভাবলো, রাঙা বউয়ের ঘর হয়ে যাই একবার। বেচারা বড় দুঃখী। জীবনটা ওর ছারখার হয়ে গেছে।

শ্যামলাল-রাংগিদের ঘরে সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সত্যম। ঘরের ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। শ্যামলাল অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে রাংগিকে। রাংগির কান্নার আওয়াজ পেলো সত্যম। বাসনপত্র ছুঁড়ে ফেলার শব্দ।

সব ভাত নষ্ট কল্লে! ঘরে আর চাল নাই! খাব্যে কি?—আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো রাংগি।

মদ খেয়ে চুর শ্যামলাল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর। মাতাল। হ্যাঁ! পুরো মাতাল হয়ে আছে শ্যামলাল বাগদি। এসব দেখে শুনে সত্যমের চোখদু'টো জ্বলে ওঠে। জড়ানো গলায় গালাগালি করে যাচ্ছে শ্যামলাল—

ভাত খাঁইত্যে হব্যেক লাই! আমার পাঁইট চাই! পাঁইট! পাঁইট লে আও! অ্যাই হারামজাদি মাগী! লোডিংবাবুকে পাস যাও! পাঁইটকা রূপাইয়া লে আও! যা বে

শালী। যা, যা! শুইনতে পারছিস নাই কেনে বটে?

এ-কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না সত্যমের। কোলিয়ারিতে লোডারের কাজ করে শ্যামলাল। মাইনে ভালো। কিন্তু ও দিনরাত মদ গিলে বেহাল হয়ে থাকে। কাজে যায় না। অনেক কামাই। মাইনের অর্ধেকও তার পাওয়ার কথা নয়। হিসেব মতো ওর চার্জশিট খেয়ে চাকরি থেকে খারিজ হয়ে যাবার কথা। তা হয়নি মোমশ্ব রাংগির গনগনে শরীরের জন্য। শ্যামলের চাকরি বাঁচাতে রাতবিরেতে লেবারসাহেব না হয় হাজারিবাবুর কাছে যেতে হয় রাংগিকে। বিয়ের পর বছরখানেক দাঁতে দাঁত চেপে লেড়েছে সে। কিন্তু দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা, আর শ্যামলালের অমানুষিক মারধর খেয়ে সে শরীর খুলে দিয়েছে পরপুরুষের কাছে। পাথুরে খনি এলাকায় সেই পরপুরুষরাই রাজত্ব চালায়। হাজারিবাবু, লেবারসাহেব আর লোডিংবাবুরা। ওদের হাতে অনেক কাঁচা পয়সা। ওদের বউ ছাড়া চাই আরো মেয়েমানুষ। সেই মেয়েমানুষদের কয়লার দেশের লোকেরা বলে স্টেপনি। স্বামীর কাছে চরম নির্যাতিতা আতর বৌ, রেশমী মালাকার ছেপলি বাদ্যকর বা রাঙা বাগদিদের মতো মেয়েরা এভাবেই স্টেপনি হয়ে যায়।

সাতসকালে এভাবেই গালগালির ফোয়ারা ছোটালো শ্যামলাল। রাংগি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে, তুমি রাঁইত্যে ডিউটি ধরো নাই? বুল্য, বুল্য! মদ খেঁইয়্যে কুন্ ভাগাড়ে ছিল্যে?

চওপ! শালী, একদম কথা বুলবিক লাই! শালী রেন্ডি! সক্কালে কুথা গিইছিলি হাঁ?

তুমি গিলবে না? তাই যোগাড় কইত্তে গিইছিলুম!

হাঁ, হাঁ! গিলব বটে। পাঁইটের টাকা চাই আমার। আজ রাঁইত্যে লোডিংবাবুর থেকে টাকা লিঁয়ে আসবি।

পারব্যক লাই হামি।

পারবিক লাই! পারবিক লাই হারামজাদি! শালী রেন্ডি! আলবৎ পারবিক!

উন্মত্ত-মাতাল শ্যামলাল রাঙা বউয়ের চুলের মুঠি টেনে ধরে ঠাস ঠাস করে গালে চড় মারতে থাকে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে রাঙা বউ। ধাওড়ার কেউ আসে না ওদের ধরতে। এসব তো ওদের রোজকার ব্যাপার।

কিন্তু স্থির থাকতে পারলো না সত্যম রুইদাস। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো ওদের ঘরের বাইরে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না এতক্ষণ। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত মুহূর্তে শ্যামলালের ঘরে ঢুকে পড়লো সত্যম।

দেখলো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! ঘরময় ভাত ছড়িয়ে গেছে। ভাতের হাঁড়ি, থালা-বাসন চারদিকে উল্টে পড়ে আছে। চড় খেয়ে রাঙা বউয়ের শ্যামলা গালদুটো লালাভ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। শাড়ি প্রায় খুলে গেছে

শরীর থেকে। ব্লাউজের বোতাম ছেঁড়া।

কি করছো শ্যামলালদা! কি হঁইনছে ই-সব? ভাল্য করছো বটে ই-সব তুমি?

কথাগুলো সত্যমের মুখ থেকে প্রবল বেগে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

টালমাটাল অবস্থা শ্যামলাল বাগদির। গলা পর্যন্ত মদ ঢেলেছে। রাঙা বউ শ্যামলালের হাত থেকে নিজের চুল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। লজ্জা! লজ্জা! যুবক সত্যমের সামনে তাঁর অর্ধনগ্ন নারীশরীর হাট হয়ে আছে। ঢাকবার উপায় নেই, এমনভাবে চুল ধরে আছে শ্যামলাল।

ছাঁইড়্যে দাও শ্যামলালদা। ছাঁইড়্যে দাও। ই-সব কি হঁইনছে?

নাগর আঁইসলেন বটে মাগীর।—মাতাল শ্যামলাল হিস্‌সিস্‌ করে বিষ ঢেলে দেয়।

ই-সব কী বুলছ্য তুমি বটে? হাঁ!

মাথার ঠিক নেই শ্যামলালের। আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। মনুষ্যত্বের ন্যূনতম আবরণও এখন ওর মধ্যে নেই।

হাঁ হাঁ! সাচ বাত বুলছ্যি হামি। ই-শালীর গতরের উপর তুয়াদের বহুৎ লোভ বটে। দ্যাখ, দেঁইখ্যে লে! বলেই শ্যামলাল চুল ছেড়ে দিয়ে একটানে রাঙা বউয়ের শাড়ি খুলে দেয়। সায়া আর বোতাম ছেঁড়া ব্লাউজ পরনে এখন রাঙা বউয়ের।

চোখ বোজে সত্যম রুইদাস। চূড়ান্ত নেশাগ্রস্ত টালমাটাল শ্যামলাল আর নিজের ভার বইতে পারলো না। আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারালো। মুখ দিয়ে ওর গ্যাঁজলা উঠছে তখন।

তাড়াতাড়ি শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিলো রাংগি। সত্যম রুইদাস তখনো মুখ ফিরিয়ে। লজ্জার মাথা খেয়ে রাংগি বললো, ছাড়ান দ্যাও সইত্যম! ঘর যাও বটে তুমি। ইতো আম্যাদের রোজের ব্যাপার বটে।

সে কথায় কান দিলো না সত্যম। বললো, রাঙা বউ, তুমার ঠোঁটের কষ বেঁইয়ে খুন গঁড়াইনছে। মুছ্যে লাও। ইটা মানুষ লয়! ই কী চইলছ্যে তুমাদের সনসারে? হা ভগবান! ইত্য কষ্ট! হায় রে! ই তুম্যার মরদ বটে!

এই বুঝি প্রথম রাঙা বউ ওর দুঃখের ভাগীদার পেলো। পেলো সমব্যথী। যে দুঃখ-যন্ত্রণাকে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলো সে, তা সরে গিয়ে বুকের মধ্যে জোলো বাতাস ঢুকলো হু-হু করে।

ভেঙে পড়লো রাঙা বউ। গমকে গমকে বেরিয়ে আসতে লাগলো কান্না। মজুর ধাওড়ার সেই ছোট বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো রাংগি, রাঙা বউ। এই সমাজের কাছে যে শুধুই স্টেপনি, পরপুরুষের ভোগ্যা। যার শরীরটাকে সবাই খুঁজে বেড়ায়, মনটাকে নয়। বিয়ের পর ছ'মাসও স্বামীর সোহাগ পায়নি সে। তখন থেকেই তার মনে বালাই নেই। শয়তান শ্যামলাল বুঝেছিলো,

রাংগির শরীর সবাইকার চোখ টানে। রাংগি তার সম্পত্তি। ওকে দিয়েই পয়সা কামাবো।

এই হলো রাংগির স্বামীসুখ। তীব্র জ্বালায় নিজে জ্বলেছে এতদিন। স্বামীর জবরদস্তি আর প্ররোচনায় নিজেকে বহুভোগ্যা করে তুলেছে। শরীরের আগুনকে তীব্র করে তুলে জ্বালিয়েছে লোভী জানোয়ারগুলোকে।

সত্যম দেখছিলো, সত্যম বুঝতে পারছিলো, যে মনটাকে পাথর করে রেখেছিলো রাঙা বউ, সেই পাথরে বানের জলের প্রবল প্রবাহ বইছে।

সত্যম ভাবছিলো, কী করবো আমি? পরের ঘরের বৌ। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় আমি মাথা গলালে লোক আমাকেই দূষবে। কিন্তু এ-রকম অত্যাচার চলতেই থাকবে? একটা মেয়েকে পিষে মেরে ফেলছে জানোয়ারটা।

ফুলে ফুলে কাঁদছিলো রাঙা বউ। এভাবে ফেলে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছে না সত্যমের। সত্যম লুটিয়ে পরা রাঙা বউয়ের সামনে গিয়ে বসে। তার মনভরা অস্বস্তি। উদোম পিঠে হাত ছোঁয়াতে ভরসা পায় না সে।

উঠ্যে পড় রাঙা বউ। উঠ্যে পড়। কাঁইদলে সমস্যা যাব্যেক লাই।

ওদিকে ওয়াক-ওয়াক শব্দে বমি করে ফেললো অচেতন শ্যামলাল। সেদিকে একবার দেখলো সত্যম। এবার রাঙা বউয়ের ডান হাতটা ধরে বললো, উঠ্য রাঙা বউ! উঠ্য।

এমন সস্নেহ স্পর্শ রাঙা বউ বহুদিন পায়নি। যেখানে কামনার লেশমাত্র নেই। এই নারী সব বোঝে। এই ক'বছরে পুরুষদের সে চিনে নিয়েছে শরীর আর মনের সকল অনুভূতি দিয়ে। সত্যমের এই স্নেহস্পর্শে দীর্ণ সেই নারীর মন বানভাসি হয়ে গেল একেবারে।

উথাল-পাথাল সামুদ্রিক ঢেউয়ের ছোঁয়া পেলো রাংগি। সমুদ্র গর্জন উঠলো ওর বুকের ভেতর। রাংগি উঠে বসেছে। অবিন্যস্ত চুলে ওর চোখমুখ আধো ঢাকা পড়েছে। তার ফাঁক দিয়ে রাংগির জলভরা বিহ্বল চোখদু'টো দেখতে পেলো সত্যম। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল এই পৃথিবী। রাংগির কোন সুখ নাই। রাংগির কোন সোয়াস্তি নাই। সুখ-সোয়াস্তি বিনা রাংগির এই শুখা বুকের মধ্যে নদীতরঙ্গ উঠলো। ঢেউ, প্রবল ঢেউ। আবেগ-অভিমান-রাগ-দুঃখ সেই জলতরঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। সুডৌল-শ্যামলা রঙ স্তনদু'টো প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে। তার চোখদু'টোয় টাটকা রক্ত এসে জমা হয়েছে—টকটকে লাল!

রাঙা বউ! কি হঁল্যো তুমার? মাথা ঠাণ্ডা করো।

রাংগির উন্মাদ চেহারা দেখে ধীর স্থির শান্ত স্বরে কথা ক'টা বললো সত্যম। নিজেকে সংহত করতে পারে সত্যম রুইদাস।

তখনই তীব্র হাহাকার আর আবেগ নিয়ে সত্যম রুইদাসের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রাংগি।

অপ্রস্তুত-হতবাক্ বিমূঢ় সত্যম রুইদাস বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। রাংগি তখন তার কালোবরণ প্রশস্ত বুকে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে।

সত্যম রুইদাসের সমস্ত চিন্তাভাবনা তখন ওলোটপালট হয়ে গেছে। রাংগির অবিন্যস্ত চুলে হাত রেখে সে বললো,

এ আসমানের নিচে এত দুখ্ চিরকাল থাইকব্যে না রাঙা বউ। তুমি দেঁইখ্যে লিও।

দুই

অজয়ের তীরে বন-বাদাড়, উঁচু নিচু ভূমি। রাস্তা চলেছে এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে কয়লাখনির হেড গিয়ার দেখা যায়। কোথাও তা প্রাণবন্ত। কাজ করছে লোকজন। তাই জমজমাট। লেবারদের ছোটাছুটি। ট্রাকের আনাগোনা। দূরে একটা ওপেন কাস্ট মাইনের পাহাড় সমান ঢিবি দেখা যাচ্ছে। পাকা রাস্তা ধরে কয়লা বোঝাই ট্রাক ছুটছে। সেই ট্রাক সোজা গিয়ে উঠবে জি টি রোডে। যাত্রীবোঝাই বাস, মিনিবাসও চলছে। যাবে রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল, ছত্রিশগন্ডা অথবা চুরুলিয়া। কয়লাখনির জীবন। সে জীবন এখন অস্তমিত সূর্যের মতো। থেমে থেমে চলেছে। যখন তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে কোন খনি। শ্রমিকদের, ডাম্পার চালক কিংবা লোডারদের চিন্তার শেষ নেই। তবুও চলেছে পাথুরে ভূমির ওপর এক বিচিত্র জনজীবন।

ই সি এল-র গৌরাংডি খনির বেশ নাম। তার পাশাপাশি অজয়ের তীরে আরো অনেক খনি। কোনটা বন্ধ, কোনটা চলছে। এমন একটা খনিতেই কাজ করে সত্যম রুইদাস। বয়েস সাতাশ বছর। চেহারা মরদের বাচ্চার মতোই। যেন ছেনি দিয়ে পাথর কেটে কেটে তৈরি। রুইদাসরা জাতে মুচি। সমাজের পতিত অংশের মানুষ। আগে তো একেবারে অস্পৃশ্যই ছিলো। এখন দিন পাল্টেছে। অত ছুঁৎমার্গ নেই মানুষের। তবুও সমাজে এখনো সত্যমরা উপেক্ষারই পাত্র। খনি কোম্পানির ধাওড়ায় আরো সব লেবারদের কাছে অবশ্য জাতপাতের বালাই নেই। সেখানে সত্যম ভাই সবারই আদরের। কারণ, সত্যম গুণী মানুষ।

অজয়েব তীর ধরে অপরাহ্নের রঙ লেগেছে। দিনের শিফট শেষ হলো। খনি থেকে একে একে উঠে আসছে মজুররা। ক্যাপল্যাম্প আর টোকেন জমা দিয়ে সত্যম বাড়ির পথ ধরেছে। নদীর পাশাপাশি হেঁটে চলেছে সে। পথ অনেকটাই। যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে। চুপচাপ চলেছে সত্যম। তার মনের মধ্যে এখন তোলপাড় কান্ডকারখানা চলছিলো। গত চারদিনে সত্যমের মনের পরিবর্তন লক্ষ্য

করেছে সবাই। খাদানের মধ্যে আখতার তো তার মনমরা মুখ দেখে জিজ্ঞেসই করলো, সত্যমভাই, কি হঁইনছে বুল্য ত তুমার?

কেনে, কেনে? কিচ্ছু হয় লাই বটে!

হঁ হঁ! ছুপালে হব্যে! কিছু ত হঁইনছেই। বতাও তো বটে!

বিষণ্ণ হাসি হেসে সত্যম আখতারকে বলেছিলো, বুঝল্যে আখতারভাই, এ পিথিমি ট ভারী শক্ত বটে। সুখ লাই, কুখাও সুখ লাই গঁ!

কি হঁইনছে বতাও না ভাই?

সত্যম কিছু বলে না। গুনগুন করে গান ধরে—

এ দুখ্ রজনী
কেমনে যাবে জননী?
এ মানব জনমে,
এত কষ্ট কেনে?
কেনে এত বেথা?
মা গো!
বল গো মা
পিথিমি!

সত্যম নিজের মন থেকেই গান তৈরি করে, আর সুর ভেঁজে গুনগুন করতে করতে পথ চলে। আখতার, দিবাকান্ত, সুবলরা তার পাশে পাশে পথ হাঁটে। ওরা চুপচাপ হয়ে যায়।

চুপচুপ হয়ে যাবারই কথা সকলের। সত্যমের চেহারাটা ডাকাবুকো ঠিকই, কিন্তু তার মুখটা নম্রতা আর মায়ামাখানো। ঝাঁকড়া চুল। যখন সে নিজেরই রচনা করা গান গায়, অথবা মালভূমির চলতি গান, —তা থেকে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক প্রবাহ। তাতে সবাই কেমন যেন আপ্লুত হয়ে পড়ে। কোথাও বুঝি বা হারিয়ে যায়। ওভাবে হারিয়ে যায় বলেই আর কোনো কথা থাকে না তাঁদের। সেই চুপ উপত্যকায় শুধু রুইদাসের কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াতে থাকে।

সত্যমের গুনগুন সুর এবার ভাষা পেলো। 'এ দুখ রজনী। কেমনে যাবে জননী/ এ মানব জনমে/ এত কষ্ট কেনে/ কেনে এত বেথা....!' 'কেনে এত বেথা?'— এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা চলমান মানুষগুলোর পাশাপাশি নদীতীরের প্রকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো নিমেষেই।

নিজেদের গ্রাম চলে আসায় এক এক করে আখতার, দিবাকান্ত, সুবলরা আর সঙ্গী রইল না সত্যমের। একা সত্যম রুইদাস চলেছে। সে এখন গলা ছেড়ে গান গাইছে। 'এত কষ্ট কেনে? এ মানব জনমে?' তার মিষ্টি ভরাট গলার এই করুণ সুরের জিজ্ঞাসা নদী উপত্যকায় উচ্চাবচ ভূমিকে ধাক্কা দিতে লাগলো। নদীকিনারে,

সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো সেই জিজ্ঞাসা— কেনে এত বেথা মা গো?

রাঙা বউয়ের সেদিনকার সেই আর্ত আত্মসমর্পণ সত্যমের কণ্ঠে সঙ্গীত হয়ে দূর অরণ্যানীর সবুজশীর্ষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভারী দুঃখী করে তুললো প্রকৃতিকে। এই চার দিনে তার মনের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সত্যম তো কোনদিনই বেশি কথা বলে না। খাদানে নেমে সে নীরবে কয়লা কাটে। তার সঙ্গী মজুরদের সঙ্গে সে কথা বলে ঠিকই, তবে তা খুবই কম। অবশ্য সে নিজের মনে গান গায় সবখানেই। খাদানের নিচেও। সে গান গেয়ে বিভোর করে দেয় সবাইকেই। কিন্তু ক'দিন ধরে সে নিজের মনে সমানে কথা কয়ে যাচ্ছে। কি কথা? সত্যম রুইদাস জানে না, কী সেই কথা? তার অন্তরে-বাইরে রাঙা বউ বসে আছে। 'কেনে এত রাঙা বউয়ের মুখ ভেঁইসে ভেঁইসে আসে? কেনে? কেনে?' এ-প্রশ্নের উত্তর নেই। কিন্তু তবুও সেই রক্তাক্ত দীর্ণ মুখমণ্ডল, দীঘল শরীর, উন্মুক্ত স্তনযুগল, জলে টইটম্বুর চোখদু'টো তাকে বড় ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। এই চারদিনের মধ্যে ওর সঙ্গে আর রাঙা বউয়ের দেখা হয়নি। সত্যম এড়িয়েই চলেছে শ্যামলালের ধাওড়া। তবুও জানালা দিয়ে চোখ পড়ে যায়, রাঙা বউ টিপকল থেকে জল আনতে যাচ্ছে পেতলের কলসী নিয়ে। সত্যম চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চোখ তো ফিরিয়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনকে কি সে ফিরিয়ে রাখতে পেরেছে?

হায় রে মন! তুয়ার কি হল্য? —সত্যম নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। কোথা থেকে হু-হু করে উল্টোপাল্টা ঘূর্ণিবাতাস ঢুকে পড়ছে ওর বুকের মধ্যিখানটায়, তা সে নিজেই জানে না। সত্যম নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'কেনে ইমন হঁইন্‌ছে? রাঙা বউ ত হাম্যার কেউ লয় বটে! তবে কেনে ই মন পাগলপারা হঁইন্‌ছে! উয়াদের কাজিয়া মিট্যে যাবেক একদিন। স্বামী-ইস্‌তিরি সুখ্যে থাক।'

এই সব ভাবনায় টালমাটাল মন নিয়ে সত্যম রুইদাস অজয়ের তীর ধরে চলেছে ঘরের দিকে। উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে সে ভুলে থাকতে চাইছে মনের ভেতরকার এই ঝোড়ো বাতাসকে। সন্ধে হয়ে এলো। দূরে দিগলপাহাড়ি অরণ্যাঞ্চল ঘন আঁধারের স্তূপ হয়ে যাচ্ছে। নদীর বাঁ দিকে উন্মুক্ত আকাশ এখনো আলো দিচ্ছে। মহুয়া বাগান থেকে ভেসে আসা মহুল বাতাস সত্যম রুইদাসের উজাড় করা কণ্ঠের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। মহুয়াগন্ধ মাখানো সেই গান শুধু এই আসমান জমিনকেই মাতাল করেনি, মাতাল করেছে সত্যমকেও। সত্যম উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিলো।

ও যখন গ্রামে এসে পৌঁছলো, তখন পেরিয়ে গেছে সন্ধে। অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। আর গান গাইছে না সত্যম। নিশ্চুপে নিজের ধাওড়ায় ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সমস্ত পৃথিবী চুপ হয়ে গেল। এখানে সত্যম একাই থাকে। ওদের বাড়ি বাঁকুড়া

জেলার বড়জোড়ার কাছে এক গ্রামে। সেখানেও নদী আছে। তার নাম কংসাবতী। তার থেকেও দূরে দ্বারকেশ্বর। শিশুকাল থেকেই তার নদীর সঙ্গে বসত। নদীর সঙ্গে গান। নদী তার জীবনেরই সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় নৈঃশব্দ্যে গায়ে মেখে সত্যম রুইদাস নদীকেই অনুভব করছিলো। তার বুকের মধ্যে অজয়। তার বুকের মধ্যে কংসাবতী। তারই বুকের মধ্যে দ্বারকেশ্বর ছলছল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। স্তব্ধ চরাচর। ধাওড়ার ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু আলো জ্বালায়নি সে। খেতে ইচ্ছে করছে না তার। একবার বালতিতে গ্লাস ডুবিয়ে জল খেয়ে চুপচাপ মেঝেতে পাতা মাদুরে শুয়ে রইলো সত্যম। সন্ধে থেকে চলতে চলতে তারাভরা আকাশ এমনি করেই রাতের দিকে চলে গেল। ঘুম পাহাড় থেকে সম্মোহনী বাতাস এসে গ্রামের সবাইকে চুপ করিয়ে দিলো এক সময়। রাত একটা বাজলো।

ঘর খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো সত্যম। স্বপ্নের মধ্যে নানা বিচিত্ররূপে চলে আসছে নদী। তার বাল্যের নদীর সঙ্গে এখানকার অজয় একাকার হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের স্তরে স্তরে উচ্চাবচ ভূমি, দুরন্ত সূর্য আর সন্ধ্যার মহুল বাতাস তার মস্তিষ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে গভীর অন্তস্তরে ধাক্কা মারছিলো। এত আলো! সত্যম অবাক। সে আরো অবার হলো, যখন দেখলো, সেই অগ্নিকুন্ড থেকে এক অগ্নিবর্ণা নারী বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে। আগনের আঁচ পেলো সত্যম। বুঝি বা তার শরীরী স্পর্শ! স্বপ্নের মেঘবাতাসে ভাসতে ভাসতে সত্যম রুইদাস দেখলো, অগ্নিবর্ণ পোশাক খুলে ফেলে সেই নারী নিরাবরণ তার সামনে। শ্যামলা রঙ, দীঘল শরীর, শান্ দেওয়া ছুরির মতো চোখদুটোয় যন্ত্রণা জমে আছে। তবুও সমুন্নত স্তনচূড়া, তীক্ষ্ম নাক আর মাথায় ঘন কালো চুল তাকে উদ্ধত-গর্বিত করে তুলেছে।

....সত্যম স্পষ্ট টের পেলো, তারই পাশে, তার শরীর ছুঁয়ে সেই নারী দাঁড়িয়ে আছে। অনন্তকাল বুঝি সময় বয়ে যাচ্ছে। কি করবে সত্যম? মনের এই দোলাচল অবস্থা তার বারে বারে আসে। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে। এই অগ্নিময়ীকে সে কী বলবে? কি-ই বা বলার আছে তার! কিন্তু কিছু বলার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যেই জেগে উঠছিলো সত্যমের সেই অন্তস্তল থেকে।

তখনই সে এক নারীর ব্যথাক্রান্ত, করুণ কণ্ঠ শুনতে পেলো। সেই কণ্ঠে ছিলো মায়া, সেই কণ্ঠে যাদুও ছিলো।

সইত্যম! সইত্যম! উঠ্য বটে! অই গঁ। উঠ্য!

স্বপ্নের জগতে চলতে চলতেই সত্যমের মনে হলো, এ তো স্বপ্ন নয়। এ একেবারে নিবিড় বাস্তব। জীবন্ত। তবুও ঘুমঘোর ভাঙলো না তার। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে কোন এক শ্রান্ত নারী করুণকণ্ঠে তাকে ডেকেই চলেছে শুধু—

সইত্যম! উঠ্য সইত্যম! ইত্য ঘুম কেনে তুমার?

সেই ডাক আর হাতের ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল সত্যমের। সে ধড়ফড় করে উঠে পড়লো।

কে? কে? কে বটে?

চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলো না সত্যম। তন্দ্রাঘোর কেটে স্বাভাবিক হতে মিনিটখানেক লেগে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। মনে হচ্ছে লোডশেডিং। বাইরে কোথাও আলো নেই। নিজে স্বাভাবিক হয়েই এক নারীশরীরের স্পর্শে চমকে গেল সে। ছলাৎ করে উঠলো ধমনীতে বয়ে চলা রক্ত। চিনে নিতে ভুল হলো না সত্যমের।

তুম্যি! রাঙা বউ? ইত্য রাইতে? ইখানে!

হাঁ, আমি। তুমি রাইত ভর দোর খুল্যা রেখ্যে নিদ যাঁইনচ্ছো?

এই কথার উত্তর দিল না সত্যম। নানা ভাবনার মধ্যে সে যে কখন ঘুমের গভীরে চলে গিয়েছিলো, সে তো নিজেই জানে না। কিন্তু এবার হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সত্যম। সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। এত রাতে একা সত্যমের ঘরে একা রাঙা বউ! এ তো সর্বনাশের ব্যাপার! ও-সমস্তটাই আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগলো তার। চারধারে গভীর অন্ধকার। নিশ্চয়ই লোডশেডিং। কিন্তু একটা অনুচ্চারিত সুখ এবার ওর বুকের অনেক ভেতর থেকে উথলে উঠছে। তার আরেকা মন বললো, সত্যম, এ-কটা দিন ধরে কি তুমি রাঙা বউয়ের কথা ভাবোনি? তাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখোনি? —হ্যাঁ, এটা তো সত্যি কথাই যে, সেদিনের ওই ঘটনার পর কে রাঙা বউ তোমার মন জুড়ে বসে আছে। তবে আর কেন সর্বনাশের ভয়? তোমার তো সুখ হচ্ছে সত্যম। এই যে এখন তোমাকে ছুঁয়ে বসে আছে রাঙা বউ, সে তোমাকে তার সবই বুঝি দিতে চায়। তুমি নিতে পারো? হিম্মত আছে তোমার? এসব ভাবনার দোলাচলে সত্যম যখন আনমনা, রাঙা বউ তখন কথা বললো।

সইত্যম, দুপুর থিক্যে ঘরে এক্যা বঁইস্যে আছি। মন মাইন্‌ছে না। মন ভাল লয় একটুকুন।

শ্যামলদা ঘরকে নাই?

দুপুর থিক্যে নাই। লোডশেডিং হঁঞি গেঁনছে। চারধার অন্ধকার।

ভয় কঁইরছ্যে বটে?

নায়। কুন ডর লাই হাম্যার। লেকিন এই বুকের ভিত্যরটায় জ্বলন হঁইন্‌ছে। মন মাইনছে লয়। তুম্যাকে ভাবছি। তুম্যার কথা বারবার মনে হঁইন্‌ছে সইত্যম।

কেনে?

সুহাগ আমায় কেউ করে না সইত্যম। কোনই আদমী লয়। তুমি সিদিনকে—

চুপ যাও রাঙা বউ। চুপ যাও! ই ট্য কুন জীবন বটে? মাইনষের জীবন?

আমি তুমার কে? আমি কি করব্য তুমার লেইগ্যে? সি রাতে থিক্যে আমার মন পুঁইড়ে পুঁইড়ে খাক হঁই যেঁনছে।

স্তব্ধ, নির্বাক রাঙা বউ। তার জন্য কারো মন পুড়ে খাত হয়ে যায়? সে তো ভাবতেই পারে না! তার শরীরটার জন্য অনেকেই পোড়ে। পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করে। সত্যম তো ভুলেও তার কাছে যায়নি। সেদিনের ঘযনার পর সত্যমকে কাছেপিঠেই পায়নি সে। তার চোখ তৃষার্ত ছিলো বৈকি! খুঁজে ফিরেছে তাকে। রাগ হয়েছে। অভিমান হয়েছে। মনে মনে সে তাকে কাপুরুষও বলেছে। কিন্তু সত্যম তার কথা ভাবছে! সে বিচলিত। রাঙা বউ যে একজন মানুষ চায়। রাঙা বউ নির্বাক। দু'চোখ দিয়ে তার জলস্রোত নামে। জলস্রোত। জলস্রোত। সত্যিকারের মানুষ খুঁজছে রাঙা বউ। স্বৈরিনী রাংগি ভিতরে-বাহিরে ভিজতে থাকে। নির্বাক-মুখর কান্না ক্রমশ বাড়ে। দমকে দমকে যুবতী শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। আবেগ! অভিমান এই জীবনটার ওপর তীব্র অনুযোগে রাঙা বউ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সবলে সত্যমের দু'টো বাহু আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলায়। একটা আশ্রয় চাই তার।

সত্যম কি একই আবেগে আক্রান্ত? এতক্ষণে অন্ধকার সয়ে এসেছে তার। সে দেখতে পাচ্ছিলো, দুঃখস্রোতে ভেসে যাওয়া, ডুবন্ত রাঙা বউয়ের শ্যামলবর্ণ রূপ। অপরূপ সেই রূপ তার শিল্পীচোখে বিরাট হয়ে উঠলো। অশ্রুভারাক্রান্ত, আনত, কৃষ্ণকালো সেই রূপসী নারীকে অনেক অনেকক্ষণ দেখলো সে। বহুক্ষণ। .... এভাবেই দুর্দমনীয় এক শক্তির জন্ম হচ্ছিলো তার শরীরে। একদিকে ক্রোধ তার দুটি হাতে সৃষ্টি হচ্ছিলো আশ্রয়স্থল। বাসা। এইসব অভূতপূর্ব রাসায়নিক মিশ্রণে বিরাট হয়ে উঠলো সত্যম। ছুঁয়ে ফেললো আকাশকে। ভরপুর হয়ে উঠলো সেই পুরুষ।

ক্রন্দনভারাক্রান্ত সেই নারী। তার দুঃখ বোধহয় সাগরতল ছুঁয়ে যায়। সেই হাহাকারকে গ্রহণ করতে থাকে সত্যম রুইদাস। আর তার মনোগহীনে সৃষ্টি হওয়া পুঞ্জীভূত শক্তিকে সে সংহত করে। সেদিন সঙ্কোচের দারুণ বাধা ছিলো। আজ নেই। সমাজ-সংসারের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় কবি।

সেই সুঠামদেহী যুবক যন্ত্রণাদগ্ধ স্বৈরিনী রাংগিকে বেঁধে ফেলে প্রবল আলিঙ্গনে। সমস্ত পৃথিবী তুচ্ছাতুচ্ছ হয়ে যায়। প্রবল শক্তির সেই বাঁধনে নিজের সমস্তকিছু সঁপে দেয় রাংগি, রাঙা বউ।

আকাশে চাঁদ ছিলো না। ছিলো সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবতারা। নক্ষত্ররাজির সেই আকাশভরা আলো এই সনস্তব্ধ পৃথিবীতে বুঝি বা ক্ষীণরেখায় নেমে এসেছে। সেই আলোয় কৃষ্ণরূপসী রাংগিকে বহুক্ষণ ধরে দেখতে থাকে সত্যম রুইদাস।

তার কঠিন আলিঙ্গনে সমস্ত ভার অর্পণ করে বহুক্ষণ চুপ করে থাকে রাংগি। সত্যম কথা বলে।

রাঙ়া বউ!

হুঁ, বল্য!

তুমাকে লতুন কইরে বাঁইচত্যে হব্যে। ই জীবন থিক্যে পাঁলাইতে হব্যে।

রাংগি চুপ করে থাকে। এতদিন সে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে নিজে লড়েছে। অভিনয় করতে হয়েছে। হতে হয়েছে রতি পটিয়সী। আজ মনে হয় সঙ্গী পাওয়া গেল। বন্ধু। মনের মানুষ। কিন্তু তবুও একটা তির তির করা সন্দেহ খচ্ খচ্ করে বাজে। রাংগি তাই তার দীঘল চক্ষু তুলে সত্যমের দিকে তাকায়। সত্যমের ভাবুক চোখে কূটকাচালি নেই। সেই চোখ ঝকঝক করছে। যে চোখদু'টোকে বোধহয় বিশ্বাস করা যায়।

দু'জনে এবার তীব্রতর আবেগে একে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। তখনো আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র। সত্যম বলে, যাবক লাই তুয়াকে ছেঁইর‍্যে। গেল্যে তুয়াকে লিয়েই যাব্য। সে ভাবনা পরে হব্যেক।

জীবনের চলচ্চিত্র

গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অহীন্দ্র সেনের ছবি পুরস্কার পেয়েছিল। ছবির বিষয় ছিল মানব সম্পর্ক। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই ও বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে ফিচার ফিল্ম করে তিনি এর আগে আরো দু'দুটো আন্তর্জাতিক পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে ভরেছেন। সর্বশেষ যে কাজটি করে তিনি কান থেকে পুরস্কারটি তুলে নিয়ে এলেন, সেখানে তিনি দারুণ সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এই কথা চলচ্চিত্র সমালোচকরাই বলেছেন।

আজ সন্ধেয় এমনই একজন ডাকসাইটে ফিল্ম ক্রিটিক চন্দ্রভান মুখার্জির সঙ্গে অহীন্দ্র সেনের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল তাঁর।

সমাজের অস্থিরতা আর মুক্ত চিন্তাকে আপনি এই ফিল্মে যেভাবে এনেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য। —বললেন চন্দ্রভান।

গর্বিত হাসি অহীন্দ্র সেনের মুখে।

আধুনিক যৌনজীবনের জিজ্ঞাসা, টিন এজ সেক্স এবং তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনার কাহিনী ও ক্যামরায় শুধু জীবন্ত হয়ে উঠেছে বললে কমই বলা হয়, এই ফিল্ম ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ। আমি আমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে ঘনিষ্ঠতর দৃশ্যে অভিনয়,করিয়ে নিয়েছি সাবলীলভাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। আজন্ম লালিত ভারতীয় সংস্কার আমি ভেঙেছি।

সেখানেই আপনি কেল্লা মেরে দিয়েছেন। আপনার পরবর্তী ভেঞ্চার কী, সেটা জানতেই আমার আপনার কাছে আসা অহীন্দ্রবাবু।

আপনারা, মিডিয়া জগতের মানুষ যেভাবে আমাকে হেল্প করেছেন, তা আমি ভুলি কি করে!

চন্দ্রভানবাবুও হাসলেন। হাসিতে কৌতুক উছলে উঠলো।

বুঝলেন চন্দ্রভানবাবু, এবারও আমি আমার ফিল্মে, বলতে পারেন আমার চিন্তার বিন্যাসে চমক আনতে চাইছি। এবার বেছেছি সাঙ্ঘাতিক কঠিন এক জীবন।

কী সেই থিম?

কয়লাখনির শ্রমিক-মজুরদের জীবন। ক'দিন ধরে তাই পড়াশোনা করছি। পাতালগহ্বরে প্রতিদিন ওরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়লা কাটে। ধসে, আগুনে মারা যায়। মৃত্যুর মধ্যেই ওদের জীবন চলমান। তারই মধ্যে নরনারীর সম্পর্ক গড়ে, আবার ভাঙে। ওদের প্রেম, ওদের সংসার, ওদের যৌনতা, ওদের লড়াই— সবকিছুকে আমার পরবর্তী ফিল্মে এক ফ্রেমে বাঁধতে চাই আমি।

ওয়ান্ডারফুল! মিস্টার সেন, ওয়ান্ডারফুল আপনার আইডিয়া। আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি, অসাধারণ এক প্রোডাকশন পর্দার বুকে ফুটে উঠেছে। জুরিদের বেশির ভাগ রায় আপনার দিকে। বিদেশি প্রতিনিধিদের করতালি... বারে বারে ক্যামেরায় ফ্লাশগান ঝলসে উঠছে।

এইসব কথা শুনে অহীন্দ্র সেনের চোখ দুটো মদির-স্বপ্নময় হয়ে উঠছিলো। তিনি দেখছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের রঙিন বর্ণোজ্জ্বল আলো। .... সেরা ছবি নির্মাতার স্বর্ণ স্মারক হাতে মঞ্চের মধ্যমণি তিনিই।

চন্দ্রভান মুখার্জি চলে যাবার পর মোবাইল থেকে ফোন করলেন অহীন্দ্র সেন।

হ্যালো।

হ্যালো, অহীন্দ্রদা।

লোকেশন কনফার্ম হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। সব কাজ পাকা। ব্ল্যাক ডায়মন্ডের টিকিট কাটতে দিলাম।

কবে?

আপনি যেদিন বলেছেন। রবিবার।

ও কে। ভেরি গুড।

হাওড়া স্টেশন থেকে রবিবার ভোরের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে চেপে অহীন্দ্র সেনের প্রোডাকশন টিম সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ আসানসোল স্টেশনে এসে পৌঁছলো। স্টেশন থেকে পাঁচতারা হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনাল। আজ

বিশ্রাম। বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছবেন জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালি চৌধুরী। এই হোটেলে অহীন্দ্র সেনের পাশের এ সি রুমটা তাঁর জন্য বুক করা আছে।

বিকেলের গাড়ি রাইট টাইমেই ঢুকলো। আম্রপালি চৌধুরী এলেন। তাঁর জন্য একটা দুধসাদা অ্যাম্বাসাডার স্টেশনে মজুত ছিল। সেই গাড়ি তাঁকে নিয়ে এলো হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে।

অহীন্দ্র সেনের রুমের বেল বাজলো। তিনি দরজা খোলামাত্রই একরাশ বিদেশি পারফিউমের গন্ধ আর উদ্ধত উগ্র সৌন্দর্যের চাকচিক্য নিয়ে নায়িকার প্রবেশ। আম্রপালির অহঙ্কারী শরীরের দিকে প্রথমেই চোখ চলে গেল অহীন্দ্রবাবুর।

অহীন্দ্রদা, চলে এলাম।

গুড। কাল সকালেই শুটিং স্পটে যাবো। এখন স্নান-খাওয়া এবং রেস্ট। সন্ধে সাড়ে সাতটায় তোমাকে নিয়ে বসবো। তখন হায়লগ হাতে পাবে। তোমার ক্যারেকটারের ধরন, বিশেষ করে মানসিক দিকগুলোর ডিটেল এক্সপ্লেনেশন তখন তুমি পেয়ে যাবে।

থ্যাঙ্কস অহীন্দ্রদা।

ঠিক আছে। তোমার রুমে ঢুকে পড়ো।

আম্রপালি নিজের ঘরে ঢুকে পড়বার পরে পরেই অহীন্দ্রবাবুর কাছে এলেন তাঁর টিমের প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস।

এসো সুবোধ।

যেটা বলতে এলাম দাদা।

বলো।

লোকেশনের জন্য যে জায়গাটা ঠিক করেছি, তা হলো বারাবনি লুপ রেল লাইনের কিছুটা দূরে ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধস এলাকা। তার আশেপাশে ছোট ছোট আদিবাসী তফসিলী গ্রামও আছে।

জায়গাটা দেখে তুমি স্যাটিসফায়েড তো?

হ্যাঁ। আপনি একবার দেখুন।

কাল সকালেই চলো যাই। দেখে আসি। পরশুর জন্য একটু ওয়ার্ম আপ হয়ে যাবে।

প্রোডাকশন ম্যানেজার চলে গেলেন। পরিচালক চুপচাপ বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে। বহুক্ষণ। অহীন্দ্র সেন শুটিংয়ে নেমে সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রম করেন এ কথা সবাই জানে। তার আগে একা ঘরে চুপ করে বসে থেকে, নিজের অভীরতায় ডুব দিয়ে, পরিচালক আসন্ন কর্মপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

চিত্রনাট্যের যে দৃশ্যটি আগামী পরশুদিন তিনি ক্যামেরাবন্দি করবেন, তার সংলাপের কাগজপত্রগুলো ফাইল থেকে বের করে আরো একবার দেখে নিলেন।

মোটামুটি সমস্ত বিষয়গুলোই হাতের মুঠোয়। ফের তিনি ডুব দিলেন নিজস্ব চেতনার গভীরতম প্রদেশে।

মাপা সময়ে কাজ করেন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক। যেমনটি কথা দিয়েছিলেন, ঠিক সাড়ে সাতটায় তিনি তাঁর ছবির নায়িকা আম্রপালি চৌধুরীর ঘরে নক্ করলেন।

দরজা খুলেই উচ্ছ্বাসের মাত্রা সপ্তমে তুললো একুশ বছরের গৌরাঙ্গী।

হাই অহীন্দ্রদা। এক্কেবারে সাড়ে সাতটা! হানড্রেড পার্সেন্ট পাংচুয়াল!

না হলে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ হয় না। হয় না কোনো বড় মানের কাজ।

একেবারে জড়িয়ে ধরে আম্রপালি তার পরিচালককে তার ঘরের শোফায় এনে বসালো। প্রায় অহীন্দ্র সেনের কোলেই বসে পড়লো সে।

বিশ্বখ্যাত পরিচালক মনে মনে চল্‌কে যাচ্ছিলেন। টলে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন, কখন কোথায় চলতে হয়, আর কখন কোথায় থামতে হয়। না হলে তিনি এই খ্যাতির চূড়ায় আসতে পারতেন না।

কি খাবেন অহীন্দ্রদা?

কফি বলে দাও।

টেলিফোন তুললো আম্রপালি। বললো, দু'কাপ কফি আর স্ন্যাকস।

অহীন্দ্র সেন এখন সিরিয়াস। যে জীবনকে তিনি তুলে আনতে যাচ্ছেন, তাতে যেন চূড়ান্ত বাস্তবতা থাকে।

আম্রপালি, শোনো!

বলুন।

তুমি এক কয়লাখনি শ্রমিকের যুবতী স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবে। এস রুক্ষ্ম কঠিন কয়লাখনি অঞ্চল, সেখানে আগুন, ধস, গ্যাসে বিস্ফোরণ, এমন অজস্র বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে তোমাদের শ্রমিক বস্তিতে তোমাদের ছোট্ট সংসার। মালভূমির এই পাহাড়ী প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের জীবন যেন একাকার হয়ে আছে। এমন এক শ্রমিক বধূর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে তোমাকে।

আম্রপালি নিবিষ্টতার গহীনে নিয়ে গেল নিজের মনকে। তার পরিচালকের কথার প্রতিটি অক্ষর বুঝে নিতে চাইলো সে।

দুই

পরের দিন সকালেই ওরা চলে এলো এখানে। মালভূমির চড়াই-উতরাই জমি। বারবনি লুপ রেলপথের অদূরে ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধসে ডেবে যাওয়া

অঞ্চল। মাঠের উপর মাঠ সবুজ ধানের চারাগুলো নিয়ে ঝুলে রয়েছে এখানে সেখানে।

অদ্ভুত! যেন ভূমিকম্প হয়েছে এখানে। সুবোধ, তুমি একেবারে আমার মন মতো জায়গা চুজ করেছো। —অহীন্দ্র সেন খুব খুশি।

অহীন্দ্রদা, ওই যে কাছাকাছি যেসব গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সব আদিবাসী সাঁওতাল অথবা তফসিলী ডোম-বাউড়িদের গ্রাম। সব ঘুরে দেখে এসেছি আমি। ওদের বসতবাড়িগুলোতেও ফাটল ধরেছে।

ওই সব গ্রাম আর বাড়িগুলোকেও ক্যামেরায় ধরতে হবে।

ঠিক আছে। সে সব হয়ে যাবে।

আজ পরিচালকের সঙ্গে প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস ছাড়াও এসেছেন ক্যামেরাম্যান, লাইট এক্সপার্ট এবং আরো একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান। অভিনেত্রী আম্রপালি চৌধুরী তো এসেছেনই। তার সঙ্গে এসেছেন তাকে সর্বক্ষণ পরিচর্যা করার জন্য একজন মহিলা বিউটিশিয়ান।

তা হলে সুবোধ, আমার ঠিক যে স্পটটা চাই, তেমন জায়গাটা কোথায়?

চলুন, সামনেই আছে। সুবোধ বিশ্বাস চললেন আগে আগে। তারপর পুরো দলটা। মিনিট দশ-বারোর রাস্তা।

সুবোধ বিশ্বাস এবার দাঁড়ালেন। যে পাকা রাস্তা ধরে ওরা এতটা পথ এলো, সেই পথ সহসা উধাও। সামনে ভয়ঙ্কর এক ফাটল। মনে হচ্ছে তা যেন পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গখনির যে বিশাল হেডগিয়ারের সেই লোহার খাঁচার বেশিরভাগটাই মাটির ফাটলে ঢুকে গেছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

বেশিদিন হয়নি এই খনিতে ধস নেমেছে। কয়েকজন শ্রমিক মারাও গেছে তাতে। বললেন সুবোধ বিশ্বাস।

অসাধারণ! সুবোধ, তোমার লোকেশান চয়েজ অসাধারণ! —অহীন্দ্র সেন উত্তেজিত। দারুণ খুশি।

আম্রপালি এদিকে এসো তো!

আম্রপালি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। ধস কবলিত কয়লাখনি এলাকার প্রকৃতিতে এক ধরনের খাঁ-খাঁ শূন্যতা থাকে। তার প্রভাব পড়েছিলো তার মনে। সে খানিকটা ঘাবড়েই গিয়েছে। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো।

কী অহীন্দ্রদা?

চলো, আরো খানিকটা এগিয়ে যাই।

অহীন্দ্র সেন, আম্রপালি চৌধুরী আর সুবোধ বিশ্বাস সেই ভয়ঙ্কর ফাটলের আরো কাছে এগিয়ে গেল। ধসের যত কাছে যাচ্ছিলো আম্রপালি, ততই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলো। এবার দাঁড়ালেন পরিচালক সেন।

এক চূড়ান্ত মানবিক দৃশ্য আমি কালকে এখানে ক্যামেরাবন্দি করতে চাই।

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের কথার প্রতিটি শব্দবিন্যাস এরা নিবিড়ভাবে বুঝে নিতে চাইছিল। অহীন্দ্র সেনের প্রতিটি কথায় এখন প্রবল আত্মপ্রত্যয়।

শোনো আম্রপালি, কয়লাখনির শ্রমিক বস্তির ছোটেলাল বাগদির বউ তুমি। শ্রমিক ধাওড়ায় তোমাদের দু'জনের সংসার। তোমার ডাকনাম মুন্নি। মুন্নি বাগদি। তোমাদের একটা ছোট ছাগলছানা আছে। তুমি তোমার ঘরের সামনেটা ঝাড়ু দিচ্ছিলে। সেই সময় তোমার পোষা বেড়ালছানাটি লাফাচ্ছিলো। উল্টোপাল্টা দৌড়োচ্ছিলো। তোমাকে কল্পনা করতে হবে, ও যেন ছোট্ট একটা মানব শিশু। তাকে তুমি বলছো, অ্যাই লাফাস না! দৌড়োস না! কিন্তু সে প্রচণ্ড এক ছুট লাগালো। তুমিও ছুটলে। দিক্‌বিদিক ছুটতে ছুটতে সে ধসের গভীর ফাটলের মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল। তুমি ডুকরে কেঁদে উঠলে। এই সময় তোমাকে সন্তান হারানোর তীব্র শোক, কান্না, আর্তি সব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

আম্রপালি নিশ্চুপ।

আম্রপালি, এই দেখো, ধসের মধ্যে এই পরিত্যক্ত কয়লাখনির সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক তার রূপ। এই ভয়ানকের সঙ্গে তোমাদের রোজকার ওঠাবসা। প্রতিদিনের বন্ধন। সম্পর্ক। তুমি ফাটলের সেই কিনারা পর্যন্ত যাবে। ক্যামেরা তোমাকে ফলো করবে। তোমার এক্সপ্রেশন ক্লোজ আপে ধরবে।

কিন্তু এই সময়কার জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালি চৌধুরী ধসের ভেতরে কয়লাখনির নিকষ কালো সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়লো। সে দরদর করে ঘামছে। তার সঙ্গী বিউটিশিয়ান মহিলা ছুটে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ-ঘাড়-গলা মুছে দিলো। ফ্লাস্ক থেকে ঢকঢক করে জল খেলো আম্রপালি চৌধুরী।

না, না, না! আমি এখানে দাঁড়িয়ে শট্ দিতে পারবো না। কি ভয়ানক সুড়ঙ্গ! আমার মাথা ঘুরছে অহীন্দ্রদা। আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি না!

অহীন্দ্রবাবুর নির্দেশে সেই বিউটিশিয়ান মহিলা ও সহকারী ক্যামেরাম্যান নায়িকাকে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। পরিচালকের কপালে ভাঁজ পড়লো।

সুবোধবাবু বললেন, ডামি লাগবেই অহীন্দ্রদা।

কিন্তু এই মরুভূমিতে ডামি অ্যাক্টর কোথায় পাবো? তাও আবার হিরোইনের পাল্টা। এদিকে কাল সারাদিনের জন্য সমস্ত সেট আপ রেডি। এমন ছিঁচকাঁদুনে মেয়েদের দিয়ে কাজ হয়! যত্তো সব বোগাস!

এ-রকম একটা আন্দাজ করে আমি ডামির ব্যাপারে একটু কথা বলে রেখেছি। কিন্তু আদিবাসী শ্রমিক আর আঞ্চলিক কিছু পুরুষ-মহিলা না হলে সিনটায় রিয়ালিটি আসবে না। অ্যাবসার্ড মনে হবে। —বললেন প্রোডাকশন ম্যানেজার।

দ্যাখো তা হলে তুমি।

অহীন্দ্রদা, কোনো চিন্তা করবেন না। আজ সারাদিন পুরো পাচ্ছি। প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে যাবে। এ সব সমস্যা তো রোজকার ব্যাপার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অহীন্দ্র সেন তাঁর ছবির নায়িকাকে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেলেন হোটেলে।

পুরো ব্যাপারটা একটু ঘোরালো হয়ে গেল। তবে অহীন্দ্র সেন ভাগ্যবান এই কারণেই, যে তাঁর সহ-পরিচালক দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরী, প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস এবং ক্যামেরাম্যান ভিক্টর বাসু তিনজনই একেবারে রত্ন। একটা প্রোডাকশন ইউনিটে এমন চৌকস মানুষজন থাকলে সত্যি কথা বলতে কি, ডিরেক্টরের ভাবনাচিন্তা পঞ্চাশ শতাংশ কমে যায়। তাই হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে, একটা হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে, চেয়ারে বুঁদ হয়ে বসে রইলেন তিনি।

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে অহীন্দ্র সেনের ঘরে কলিং বেল বাজলো। পরিচালক দরজা খুলেই দেখলেন সুবোধ ও দীপ্তেন্দু দাঁড়িয়ে। হুইস্কির প্রভাবে অহীন্দ্রবাবু আচ্ছন্ন। চোখদুটো রক্তাভ।

অহীন্দ্রদা, ডামি জোগাড় হয়ে গেছে। একেবারে সলিড। এতটা সাকসেস হবো ভাবিনি।

বাঃ। তাই নাকি। তোমরা বোসো একটু। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে নেশা কাটিয়ে অহীন্দ্র সেন ঘরে নিজের মেজাজে চলে এলেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। শোক তাপ অথবা নেশা, কোন কিছু তাকে আটকে রাখতে পারে না। ঝকঝকে হয়ে বাথরুম থেকে বেরোলেন অহীন্দ্র সেন।

বলো দীপ্তেন্দু, সুবোধ।

একজন টাউটকে পাঠিয়েছিলাম ওখানকার বাউড়িপাড়ায়। একটি মেয়েকে পাওয়া গেছে। নাম শেফালী বাউড়ি। বয়েস চব্বিশ। শক্ত সমর্থ মেয়ে। বোকা হাঁদা নয়। ডেকে পাঠিয়েছিলাম। হাইটে আম্রপালিদির মতোই হবে। হিরোইন ছাগল ছানার পিছু পিছু ফাটলের পঞ্চাশ ফুট দূরত্ব পর্যন্ত যাক। বাকি পঞ্চাশ ফুট ডামি শেফালী বাউড়ি করবে। অসুবিধের কিছু নেই। ডামির ডায়লগ থাকছে না। শুধু কয়েক সেকেণ্ড ছাগল ছানার পিছু পিছু দৌড়ে যাওয়া। বাকি পঞ্চাশ ফুট হিরোইনকে ছেড়ে ক্যামেরা ডামিকে টেক করবে।

সব ব্যাপারটা নিয়ে তিনজন মিলে ঘন্টা দুয়েক আলোচনা করলো। কীভাবে কি হবে, তার নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি হলো। তারপর পাশের ঘর থেকে আম্রপালিকে ডাকা হলো। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো আগামীকালের শুটিংয়ের যাবতীয় বিষয়।

আম্রপালি যথেষ্ট মনমরা হয়ে পড়েছে। সে যত্ন নিয়েই বুঝতে চেষ্টা করলো,

কালকে তার কাজের ধরন কেমন হবে।

নিজের ঘরে যাবার সময় সে যথেষ্ট সংকোচে বললো, অহীন্দ্রদা, আপনাদের ভারি প্রবলেমে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু কি করবো বলুন! ওই বিরাট হা-হা করা ফাটল দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। গা গোলাচ্ছে।

ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! কালকের শুটিংয়ের জন্য তৈরি হও। আর সব কথা ভুলে যাও এখন থেকে। ডায়লগ মুখস্থ করতে থাকো।

দরাজ হয়ে উঠলেন পরিচালক অহীন্দ্র সেন।

তিন

স্থানীয় থানাকে বলে রাখা হয়েছিল। পরের দিন সকালেই একটা জিপে ডজনখানেক আর্মড কনস্টেবল হাজির ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধসের সামনে। ক্যামেরাম্যান সহ শুটিংকর্মীদের পুরো দল নিয়ে বিরাট একটা গাড়ি চলে এলো। এলো জেনারেটর কার। সহ-পরিচালক, মেক আপ ম্যান, সহশিল্পীদের নিয়ে এলো আরো একটা লাক্সারি গাড়ি। অহীন্দ্রবাবু আম্রপালির সঙ্গে এলেন একটা অ্যাম্বাসাডারে। টিমের লোকজন কাজ শুরু করে দিয়েছে। জেনারেটর চালিয়ে টেস্ট চলেছে। তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করা হচ্ছে। নামানো হলো ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল।

সুবোধ কোথায়? —অহীন্দ্র সেন জিজ্ঞেস করলেন?

শেফালী বাউড়িকে আনতে ওদের গ্রামে গেছে।

দীপ্তেন্দু, মেয়েটির সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছো তো? এসব কেসে পরে বড্ড ঝামেলা হয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। শেফালীর স্বামীর হাতে তিন হাজার টাকা আগে দিয়ে দেওয়া হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে শেফশলীকে দেওয়া হবে আরো এক হাজার টাকা। ব্যাস!

দেখা গেল, একটা প্রাইভেট কার ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে।

গাড়ি থামলো। নামলো সুবোধ বিশ্বাস। আরো নামলো ঋজু চেহারার একটি কালো মেয়ে এবং একটি আদিবাসী যুবক। ওদের নিয়ে সুবোধ বিশ্বাস পরিচালকের কাছে এলো দ্রুত।

অহীন্দ্রদা, চলে এসেছি। একটুও সময় নষ্ট করিনি। এই হলো শেফালী বাউড়ি। ওর রোল গুছিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এই যে শেফালীর স্বামী হরিরাম বাউড়ি। হরিরামের হাতে আগাম তিন হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি গাড়িতেই।

শুটিং স্পট তৈরি। ক্যামেরা ট্রলিতে দাঁড়িয়ে। অহীন্দ্র সেন ফিরে পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব মেজাজ। টগবগ করে ফুটছেন তিনি।

লাইট-এক্সপার্ট পকেট থেকে অ্যাপাচার মাপযন্ত্র বের করে আলোর কাঙ্ক্ষিত মাপ বুঝে নিচ্ছেন। রিফ্লেকটরম্যানরা এখানে-ওখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের নির্দেশের অপেক্ষায়।

সিনেমার পর্দায় দেখা সুন্দরী নায়িকা আম্রপালি চৌধুরীর পাশে বসে মেক আপ নিচ্ছে শেফালী বাউড়ি। শেফালী ভাবতেই পারছে না, সে স্বপ্ন দেখছে না সবটাই বাস্তব! পর্দার হিরোইন তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, শেফালী, কাজটা একেবারে ফার্স্ট ক্লাস করে করতে হবে কিন্তু। তাহলে আবার কী লাগে। জান দিয়ে দেবে শেফালী। সুবোধবাবু বলেছেন, তোমাকে দেখবে সারা দেশের লোক। শেফালী, তুমি তো প্রায় হিরোইন।

গত রাতে মাতাল স্বামী শেফালীকে বহুদিন বাদে খুব আদর করেছে। শেফালীর দৌলতে তার হাতে চলে আসছে কড়কড়ে চার হাজার টাকা। সোজা কথা! বহু-বহুদিন বাদে শেফালীর আনন্দ একেবারে উপছে উঠছে। গত রাতে তাই সে দেশি মহুয়াতেও কয়েকটা চুমুক দিয়েছিলো।

পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন।

এবার স্পট রিহার্সাল। সব রেডি!

সামনেই ছাগলছানাটি কোলে নিয়ে প্রোডাকশনের এক কর্মী। কাছাকাছি একটি সাঁওতাল গ্রাম থেকে এটিকে কিনে আনা হয়েছে।

স্পট রিহার্সাল হলো।

তারপর হলো ফাইনাল রিহার্সাল। এবার হবে কমপ্লিট শট্।

ক্যামেরা প্রস্তুত। অ্যাপারচার মিটারে আলো পরীক্ষা করে নিলেন লাইট এক্সপার্ট। আম্রপালির মুখে, বুকে তীব্র আলো ছটা। শেফালীরও তাই।

এবার কমপ্লিট ফাইনাল শট। সব রেডি। পরিচালক বললেন।

হ্যাঁ অহীন্দ্রদা। সব ওকে। দীপ্তেন্দু বললো।

নো টক্! ফুল সাইলেন্ট! অহীন্দ্র সেন ক্যামেরাম্যানকে বললেন, স্টার্ট!

ক্যামেরা চলতে শুরু করলো।

ছাগলছানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সন্ত্রস্ত ছাগলছানা দৌড়োচ্ছে আগে আগে। তার পেছনে 'এই-এই' করে ছুটলো হিরোইন আম্রপালি। ক্যামেরা টেক কছে সবটাই।

কাট্! —চিৎকার করলেন পরিচালক।

প্রথম পর্যায় এই পর্যন্ত। এবার ডামির পালা। পরিচালক বললেন, কোন ব্রেক নয়। সেকেন্ড ফেজ এক্ষুনি। ক্যামেরা রেডি। শেফালী, তুমি রেডি তো? তুমিই তো এখন হিরোইন।— শেফালী খুশিতে মাথা নাড়লো।

লাইট! ক্যামেরা স্টার্ট।

এবার টিমের একজন ছাগলছানাটির ল্যাজটা মুচড়ে বেশ করে কান মূলে ছেড়ে দিলো। তাড়া দিলো ধসের দিকে। ভীত ছাগলছানা সেদিকে দৌড়লো।

ক্যামেরা ফের চলতে শুরু করেছে। ছাগলছানার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে শেফালী বাউড়ি। অহীন্দ্র সেন নিজেও একাত্ম হয়ে গেছেন এই দৃশ্যটির সঙ্গে। তিনি চিৎকার করলেন, শেফালী আরো জোরে! আর একটু!

সে নায়িকা। হিরোইন। সিনেমায় তাকে দেখা যাবে। এই ঘোরে ছিলো শেফালী বাউড়ি। খনি শ্রমিকের বউ। দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। পরিচালক বলেছে, ছাগলছানাটিকে নিজের সন্তানের মতো ভেবে তাকে দৌড়াতে হবে। ক্যামেরার একই ফ্রেমের মধ্যে। সে নিখুঁত কাজ করে দেখাবে। একেবারে নিখুঁত। তার সামনে শুধুই ছাগলছানাটি। যে তার সন্তানের মতো।

চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক ফুটিয়ে তুললো শেফালী।

ক্যামেরা দূর থেকে জুমিং করে ক্লোজ আপে ধরেছে শেফালীর মুখ। একেবারে নিখুঁত অভিব্যক্তি।

ছাগলছানাটি ছুটতে ছুটতে এবার ধসের ফাটলের গভীরে পড়ে হারিয়ে গেল। তার ক্ষীণকণ্ঠ শুধু ভেসে উঠলো বাতাসে।

ঘোরের মধ্যে থাকা শেফালীর কানে গিয়ে পৌঁছলো ছাগলছানার সেই ক্ষীণ মৃত্যু চিৎকার। তার সন্তান! সে আরো জোরে ছুটলো। তার চোখে মুখে সন্তান হারানোর শোক আর হাহাকারের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। এ তো অভিনয় নয়! এ তো প্রখর বাস্তবের দৃশ্যপট। ক্যামেরা জুম করে ধরে নিয়েছে সেই মুখচ্ছবি।

অহীন্দ্র সেন চিৎকার করলেন।

কাট! শেফালী! থামো।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের নায়িকা শেফালী বাউড়ি তখন আর নিজের মধ্যে ছিলো না। পঞ্চাশ ফুট দৌড়েও সে থামেনি। থামার কথা তার মনে আসেনি।

এবার আর তার পা দুটো মাটির ওপরে নেই। ফাটলের গভীর শূন্যতা ধরে সে হারিয়ে যেতে লাগলো। তার মরণ চিৎকার ফাটলের দুপাশে ধাক্কা খেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিধ্বনি তুলে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল। অহীন্দ্র সেন চিৎকার করে উঠলেন—

সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়ে গেল! চারদিকে হৈ হৈ রব উঠলো। বন্দুকধারী পুলিস কনস্টেবলরা ছুটে এলো ধসের কাছে। গোটা প্রোডাকশন টিম আতঙ্কিত, বিমূঢ়।

তারই মধ্যে পরিচালক অহীন্দ্র সেন প্রোডাকশন টিমকে প্যাক আপ অর্ডার দিলেন।

চার

ভয়ঙ্কর এই ঘটনায় বিহ্বল সবাই। জনবসতি থেকে দূরে বলে গ্রামের লোক এখনো ব্যাপারটা জানে না। শেফালী বাউড়ির স্বামী হরিরাম চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। সকালে একটু বাংলা মদও পেটে ঢেলেছিল সে। এবার তার চোটে কান্নাকাটিও বেশ

বেড়ে গেল।

সুবোধ বিশ্বাস ঠান্ডা মাথার মানুষ। সে আম্রপালি ও তার সাহায্যকারী বিউটিশিয়ান মহিলা মেক আপম্যান, লাইট্ এক্সপার্টসহ টিমের টেকনিক্যাল গ্রুপটাকে আসানসোল ফেরত পাঠিয়ে দিলো। এ বার পরিচালককে বললো, অহীন্দ্রদা, দীপ্তেন্দুকে নিয়ে আপনি থানায় চলে যান। আমি হরিরামকে সামলাচ্ছি। টোটাল প্যাক-আপ করে জেনারেটর আর সমস্ত গাড়ি আসানসোল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরীকে নিয়ে অহীন্দ্রবাবু থানায় চলে গেলেন। সুবোধ বিশ্বাস তার ক্রিম রঙের টাটা সুমো গাড়ির কাছে এলো।

হামার বৌটা মর্যে গেল রে! হা ভগবান! হামার ইবার কি হব্যাক রে! হাঁই বাবুলোগ, বৌক্যে ফিঁরাইঞ দে বাবু। হা শেফালী! তু কুখাকে গেঁইলি বটে! তু কুখাকে গেঁইলি রে!

হরিরামের কান্নায় একটুও গললো না সুবোধ বিশ্বাস। কারণ সে শুনেই এসেছে, হরিরাম তার মাইনের বেশিরভাগ টাকা মদ খেয়েই উড়িয়ে দেয়। পারলে শেফালীকেই বেচে দেয়, এমনধারা লোক সে।

সুবোধবাবু হরিরামকে ঠেলে টাযা সুমোয় তুললো। নিজেও উঠলো।

হরিরাম, বোসো চুপ করে!

ধমক খেয়ে হরিরাম চুপ। সুবোধবাবু সিটের নিচে থেকে একটা অ্যাটাচি বের করলেন। এবার কড়া চোখে তাকালেন হরিরামের দিকে।

তোমার বউয়ের দাম কতো? দশ হাজার? না বিশ হাজার?

অ্যাটাচি কসের ডালা খুললেন সুবোধ বিশ্বাস। সেখানে একশো আর পাঁচশো টাকার বান্ডিল ঠাসা ছিলো। হরিরাম বাউড়ি চুপ।

পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। আজকেই কোনো আত্মীয় বাড়িতে চ যাও। গ্রামে যাবে না। কাল সকালে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

হরিরাম মনে মনে ভাবে, পঞ্চাশ হাজার! বাপ রে বাপ! কাল উটাকে যাট-সত্তর বুলব্যক। আর এক ট্য বিহা করবক। শেফালী ট্য বড় দজ্জাল ছিল্য বট্যে!

অহীন্দ্রবাবু আর দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই থানার ওসি চলে এলেন। অহীন্দ্রবাবু তাঁর ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য বজায় রেখে ওসি-র সঙ্গে কথা বলছিলেন।

সো স্যাড। আচমকা এমন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল! সো আনফরচুনেট!

চলুন, স্পটে যাই। —ওসি বললেন।

সব ঘুরে দেখলেন ওসি। বিশ্বখ্যাত এই চিত্র পরিচালককে তিনি কীই বা বলবেন! অহীন্দ্র সেন শুধু বললেন, আপনি একটু দেখবেন, যাতে আমরা এখানে

শুটিংয়ের কাজটা কমপ্লিট করতে পারি। শেফালীর হাজব্যান্ডের চাহিদামতো আমরা ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিচ্ছি।

ওসি বললেন, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পুলিস ফুল প্রোটেকশন দেবে আপনাদের।

থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! আপনি আসুন না আজ হোটেলল আসানসোল ইণ্টারন্যাশনালে।

দেখি, পারলে যাবো। কোথায় কখন ছুটতে হয়, তার তো কোন ঠিক নেই। ওসি হেসে বললেন।

শেষ পর্যন্ত পুলিস একটা মামুলি দুর্ঘটনাজনিত কেস ফাইল করলো। বিরাট বড় এক ঝঞ্ঝাট মিটলো। পরিচালক, সহ পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার অভিনেত্রী আর ইউনিযের কর্মীরা হোটেলে নিশ্চিতভাবে একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেল।

রাতে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার দিলেন ডিরেক্টর। থানার ওসি-ও চলে এসেছেন।

আরে, আসুন আসুন মিস্টার বক্সী!

হ্যাঁ, চলে এলাম আপনার লোকজনদের সঙ্গে আলাপ করতে।

বলুন, কি খাবেন? ড্রিংকস, কোল্ড, না হট? আপাতত কফি খান। তারপর অন্যগুলো হবে। আম্রপালি! এদিকে এসো! ইনি হচ্ছেন মিস্টার বক্সী। দারুণ মানুষ! আমাদের প্রবলেম সলভ্ করে দিয়েছেন। এখানকার থানার ওসি। ও হচ্ছে আম্রপালি চৌধুরি। এখনকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। আমাদের এই ছবির হিরোইন!

নমস্কার। আপনি আমাদের গোটা টিমকে এক বিচ্ছিরি অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছেন। —আম্রপালি মদির হাসি হাসলো।

ওসি সাহেব গদগদ। না না, এ আর এমন কি! আপনারা সব রিনাউন্ড পার্সন। এই ফিল্মই হয়তো ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসবে।

এ-কথায় অহীন্দ্র সেন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, যে শট্‌টা আমরা নিলাম, তার তুলনা নেই। এমন রিয়ালটি ভাবাই যায় না। যেখানে ক্যামেরার কোন কেরামতি নেই। অসাধারণ মানবিক এবং রূঢ় কঠিন বাস্তব এক দৃশ্য আমাদের ক্যামেরা আজ টেক করে রাখলো। পৃথিবীর কোন ফিল্ম ডিরেক্টর এমন উদাহরণ রাখতে পেরেছেন কি না আমার জানা নেই।

সত্যি, রিয়েলি এক্সেলেন্ট! উচ্ছ্বাসে আবেগে আম্রপালি তার পরিচালক অহীন্দ্র সেনকে জড়িয়ে ধরলো। অহীন্দ্র সেনও আজ বুঝি উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছেন।

আম্রপালি জানে, এই ছবি যদি আর্ন্তজাতিক পুরস্কার পায়, ছবির নায়িকা হিসাবে তারও পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা থাকছে। না হলেও পুরস্কৃত ছবির নায়িকা হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলে তার পরিচিতি পাবে।

তাই আম্রপালি চৌধুরি তার পরিচালকের কাছে আজ আরো মদির, আরো কামনাময়ী হয়ে উঠতে চাইলো। আত্মসমর্পিতার ভঙ্গী তার চাহনিতে, শরীরে। সে মনে মনে বললো, অহীন্দ্রদা, আজ রাতে আমি তোমারই।

এদিকে ব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার পার্টি দারুণভাবে জমে উঠেছে। হুইস্কির বোতল খোলার আওয়াজ। প্লেটে কাটা চামচের শব্দ।

বুঝলে আম্রপালি, যে ছবি আজ সেলুলয়েডে ধরা পড়লো, তাকেই এক কথায় বলা যায় লাইভ ডক্যুমেন্টশন।

রিয়েলি তাই অহীন্দ্রদা। আম্রপালির কণ্ঠস্বর তখন মদির। তার ঢলঢল কাঁচা অঙ্গ তখন পরিচালকের শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বহুদূরে কয়লাখনি ধসের সেই ফাটলের অন্ধকারে তখন শেফালী বাউড়ি নিস্পন্দ ছাগলছানাটির পাশে রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে রইলো। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো পৃথিবীর বুকে।

দেবকী বেসরা

দেবকী বেসরা। মাথায় জট পাকানো ঝাঁকড়া চুল। ছেঁড়া ময়লা একখানা ধুতি তাঁর পরনে। তাও হাঁটুর ওপর। গায়ে জামা নেই। এমনিতেই রঙ কালো কুচকুচে। ধুলো-ময়লা মেখে আরো কালোপানা হয়ে গেছে শরীরটা।

শরীর তো নয়, যেন কয়লা খাদানের পিলার। এখনো ভাঁজে ভাঁজে পেশীর ওঠানামা। তবুও মানুষটা কোন কাজে লাগল না।

চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে এসে চুপচাপ বসে আছে দেবকী। দোকানি গোলক মাঝি তাকে এক ভাঁড় চা আর এক পিস পাঁউরুটি দিয়েছে। ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বড় করে পাঁউরুটিতে কামড় বসালো সে। দু'চুমুকেই শেষ করে দিলো ভাঁড়ের চা। এবার সে ঝাঁকড়া চুলভর্তি মাথাটা সবেগে নাড়াতে লাগলো। চোখ দুটো টকটকে লাল করে জোরের সঙ্গেই বললো, হব্যাক লাই!

গোলক মাঝি চায়ের গ্লাসে চামচ দিয়ে চিনি গুলছিলো। বললো কি হব্যাক লাই?

এট্টুকু চা। হব্যাক লাই! হব্যাক লাই! আর চা দাও! উন্মাদ দেবকীর কণ্ঠস্বর আর চোখমুখের ভাবভঙ্গীর মধ্যে ছিলো অধিকারবোধের তীব্রতা। সে গোলক দোকানির কাছ থেকে তাই আরো এক ভাঁড় চা দাবি করলো।

বইস্‌সো দেবকী। বইস্‌সো বইস্‌সো! দিব্য দিব্য!

না বটে। আখ্যন, অ্যাখ্যনই দাও বটে। ঝাঁঝিয়ে উঠলো দেবকী। তার চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

আরো একটা বড় মাটির ভাঁড়ে বেশি করেই চা দিলো গোলক মাঝি। সেই চা খেল দেবকী। পাঁউরুটি পুরোটা খেল। তারপর উঠে পড়লো। গটগট করে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো আকলু মাহাতোর 'সাইকেল রিপেয়ারির শপ' এর সামনে।

এক ট্য বিড়ি দাও।

সেই একই অধিকারবোধের ভঙ্গীতে আকলুর কাছে হাত পাতলো দেবকী। একটা রেঞ্জ দিয়ে সাইকেলের স্পোক টাইট করছিলো আকলু। বললো, একটু ঠার যাও বটে! কাজ কচ্ছি লয়?

দাও দাও! বিড়ি দাও! দেবকী অপেক্ষা করতে নারাজ। এক্ষুনি তার বিড়ি চাই।

সাইকেলটা বড্ড ব্যাগরা দিচ্ছিল আকলুকে। কোথায় ধাক্কা মেরেছিল কে জানে! রিংটাই বেঁকে গেছে। তাই স্পোকগুলোকে বাগে আনতে পারছে না। দেবকীর এমন নাছোড় আচরণে আকলুর একটু মাথা গরম হয়ে গেল।

কেনে রে! তুর বাপের জমিনদারি বটে! ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো উন্মাদ দেবকী।

তবে রে! এক্কেবারে মাঁইর‍্যেই ফেইলব তুকে। —বলেই হাতের রেঞ্জটা তুলে দেবকীকে মারতে যায় আকলু।

এতেই একেবারে চুপসে গেল দেবকী। কুঁকড়ে মুকড়ে নিমেষের মধ্যেই সে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো মানুষ হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত তেজ হাওয়া।

আকলুর বাবা তারিণী মাহাতো সাইকেল রিপেয়ারিং শপের ভেতর থেকে ব্যাপারটা দেখছিলো। তারিণী খুড়ো এবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

কি হঁইএঞছে বটে?

আরে ই লাটসাহেবের ব্যাটাকে বিড়ি দিত্যে হব্যাক। বুলছে, কাজ-কাম ফেঁইল্যে থুয়ে নাকি জলদি উয়াকে বিড়ি দিত্যে হব্যে।

ছাড়ান দে আকলু। বড়হ্ দুঃখী মানুষ বটে। উয়ার আর কে আছে বাপ?

বাপ তারিণী মাহাতোর কথায় শান্ত হয় আকলু। ঠিকই, কে আর আছে দেবকীর! দেবকী বেসরা নামযার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক শূন্যথা আর হাহাকার। কয়লা খাদান এলাকার পাথুরে প্রান্তরের মানুষ ভুলতে পারে না দেবকী বেসরার কথা। তারিণীর কথায় আকলু কোমরের গেঁজ থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করলো ওকে দেবার জন্য। কিন্তু কোথায় সে? সে চলে গেছে। দোকানগুলো ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তা বরাবর অবিন্যস্ত পা ফেলে দেবকী বেসরা হেঁটে যাচ্ছে।

অ দেব্যকী! বিড়ি লাও! বিড়ি লাও! আইস্‌স্য, হেথাকে আইস্‌স্য।

ফিরেও তাকালো না দেবকী। ঝাঁকড়া চুলভর্তি মাথাটা সজোরে নাড়াতে নাড়াতে সে চলেই গেল সোজা রাস্তা ধরে।

দুই

সন্ধে নামছিলো। সূর্য ডুবে যাবার পরে যেটুকু আলো থাকে প্রান্তরে-জনপদে, সেটুকু ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। দূর দূর জনপদগুলোর গা লাগালাগি করা গাছপালা ক্রমশ জমাট অন্ধকারের স্তূপ হয়ে যাচ্ছিলো। এই গ্রামের নাম রামপুর। গ্রামের মাঝ বরাবর রাস্তাটি সোজা গিয়ে রামবাঁধ কয়লাখনি পিটকে ছুঁয়েছে।

সন্ধে নামতেই খনির পিট টপে জোরালো বিদ্যুতের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। রামপুর গ্রামের শেষ মাথায় ভাঙাচোরা একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দেবকী।

এখন আর তাঁর সেই তেজ নেই। শরীরটা কেমন যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। সেই ভাঙাচোরা ঘরটার সামনে এসে ধুপ করে বসে পড়লো সে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। দেবকী বেসরার চোখদুটোয় একরাশ বিষাদ জমে আছে।

যে তখনো বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছিল সমানে। লাইগব্যেক লাই বটে! লাইগব্যেক লাই বটে! লাইগব্যেক লাই! হুঁ! ভারী দাতাকণ্ন আঁইস্যেছ্যেন রে! তুহার বিড়িক্যে থুক! থুউক! থুউক!

এই মেজাজটাও সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। বুকের ভেতরটা তার খাঁ-খাঁ করে উঠলো। দু'হাতে মুখ ঢাকলো দেবকী। চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। তারপরই বুকের মধ্যে বুঝি তাঁর বান ডাকলো। দু-কূল ছাপিয়ে নামলো জলধারা। দুই গাল বেয়ে গড়াতে লাগলো চোখের জল। সন্ধের ঘনিয়ে আসা আঁধারেরও আলো থাকে। কিন্তু দেবকী বেসরার চোখের সামনে কেবলই অন্ধকার। পেছন দিকে ছুটছিলো তাঁর মন। দূর .....অনেক দূরের অতীতে। টুকরো ছবি.......অস্পষ্ট নানা কথা। তারই কিছু ঝিলিক দিয়ে ওঠে এই উন্মাদের মস্তিষ্কে। তাঁর যন্ত্রণাতুর ভাঙা ভাংঙা কণ্ঠস্বর অন্ধকার মাখানো দিগন্তপ্রসারী রুক্ষ্ম মালভূমি অঞ্চলের বিষাদকে আরো বাড়িয়ে দিলো।

হাঁই হামার লীলাবতী রে! হাঁই হামার ভানুমতী রে-এ-এ-এ! একই কথা বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে হাঁফিয়ে পড়লো উন্মাদ দেবকী। অন্ধকার চারদিকে। তাঁর মাথার ভেতরটায় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অতীতচারী হলো উন্মাদের মন—

ত্রিশ বছর পিছনের কথা ......ওরা তিনজন যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরছিলো। দেবকী, তাঁর বউ লীলাবতী, আর তাঁর মেয়ে ভানুমতী। রামবাঁধ খনির পিট টপের পাশের রাস্তা ধরেই ফিরছিলো ওরা। এখনকার মতো এত আলো খনির পিট টপে জ্বলতো না তখন। রামবাঁধ ইনক্লাইন অর্থাৎ সুড়ঙ্গ খনি। রাতে বন্ধই ছিলো ক'দিন।

দূর থেকে দেবকী দেখলো পিট টপে অনেকগুলো মানুষ হাঁটাহাঁটি করছে। টর্চের আলোও জ্বলে উঠছিলো বারেবারে! কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিলো। দেবকী দ্রুত পায়ে আরো একটু এগলো। এবার সে আরো একদল মানুষের ফিসফিসানি শুনতে পেলো পিটের অদূরে বাঁ পাশে রামপুরের বড় পুকুরটার পাড়ে। বৌ আর মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়াতে বলে সে পুকুরের দিকেই গেলো। ইখ্যানে ডাঁড়াও বট্যে। কি হল্যো, আমি দেঁইখ্যে আসি।

কওন ভাই! কেয়া হুয়া! অ্যাত্য রাঁইতে কি কঁইরছ্য তুমরা?

দেবকীর হাতেও টর্চ ছিলো। সে লোকগুলোকে লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললো। সব চেনা লোক। রামবাঁধ খনির গোমস্তা, চাপরাশি, দারোয়ান আর পাঁচ ছ'জন মজুর। মজুরগুলো মাটি কাটিছিলো। রামবাঁধ বড় পুকুরের চারপাশ উঁচু করে বাঁধ দেওয়া। পুকুরে টইটম্বুর জল। খনির গোমস্তা আর চাপরাশির হুকুমে সেই বাঁধ কাটছে তিনজন মজুর। বাদবাকি তিন মজুর পুকুরেরপাড় থেকে খনির মুখ পর্যন্ত নালা কাটা প্রায় শেষ করে এনেছে।

রামবাঁধ কোলিয়ারিতে বছর দু'য়েক আগেই কাজ পেয়েছে পঁচিশ বছরের তরতাজা সাঁওতাল যুবক দেবকী বেসরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে ব্যাপারটা বুঝে ফেললো। পুকুরের বাঁধ কেটে নালা দিয়ে জল নামিয়ে দেওয়া হবে ইনক্লাইন কোলিয়ারির সুড়ঙ্গে। খনি জলে ডুবে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে। দেবকীরা বেকার হয়ে পড়বে। দেবকীর মাথাটা ঘুরপাক খেয়ে উঠলো। চিৎকার করে উঠলো সে—ই তুমরা কি করছ্য বটে! খাদান ডুঁবাইঞ দিবার তাল করছঁ, হাঁ! ই কাম মৎ করো ভাই!

দেবকীর উচ্চৈস্বরে চিৎকার খোলা মাঠ পেরিয়ে রামপুর গ্রামে গিয়ে ধাক্কা খেতে লাগলো। গ্রামের কারো কারো কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। শোরগোল উঠলো। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে সেই গোমস্তা আর চাপরাশির হুকুম দেবকীর দিকে ছুটে এলো চারজন। ওরা এলোপাথাড়ি মারতে লাগলো দেবকীকে। দেবকী বেসরা তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিলো ওদের। দেবকীর চিৎকার শুনে রাস্তা থেকে ছুটে এলো বৌ লীলাবতী আর ছোট্ট মেয়ে ভানুমতী।

দেবকীকে মারছে দেখে ওরা কান্না আর চিৎকার জুড়ে দিলো। গোমস্তা রাগে গরগর করতে করতে হুকুম দিলো—উয়াদের ক্যে ধর!

চাপরাশি আর দারোয়ান দৌড়ে এসে চেপে ধরলো লীলাবতীকে। বাঁচাও বাঁচাও!

বলে আর্ত চিৎকার করে উঠলো লীলাবতী। বাচ্চা মেয়ে ভানুমতীর কান্না থেমে গেল দারোয়ানের বজ্রমুষ্টির চাপে। তাই দেখে যেন লাগামহীন বলশালী হয়ে উঠলো দেবকী। তাঁকে ঘিরে ধরা তিনজনকে প্রবল শক্তিতে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল বৌ আর তাঁর বাচ্চা মেয়ের দিকে। চাপরাশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাঁর ধাক্কায় ছিটকে পড়লো চাপরাশি। তক্ষুনিই একটা মজুরের লোহার শাবল আছড়ে পড়লো দেবকীর মাথায়।

প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে আসার আগে, ঘোলাটে চোখে দেবকী শেষবারের মতো দেখেছিলো, তাঁর বৌ আর মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। ....সেইসব টুকরো টুকরো ছবি কখনো কখনো তার চোখের সামনে হঠাৎ করে ভেসে ওঠে। লীলাবতীর সেই আর্ত চিৎকার ভেসে আসে তার কানে—বাঁচাও-ও-ও-গ! হ্যামাদেরকে বাঁচাও-ও-ও-ও-ও!

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। ফের তার মস্তিষ্কের জটপাকানো চিন্তাগুলো একেবারে হারিয়ে যায়। চোখের সামনে নেমে আসে কালো ছায়া।

আজ এই সন্ধ্যায় রামপুর গ্রামে অন্ধকার নেমেছে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায় দেবকী বেসরার মস্তিষ্কের অন্ধকার। মুখ গুঁজে পড়ে থাকে তার ভাঙাচোরা ঘরের সামনে। ক্ষীণকণ্ঠে বিলাপ চলতে থাকে—হাঁই আম্যার লীলাবতী! হাঁই আমার ভানুমতী-রে-এ-এ-এ-এ! তুয়াদের বাঁচাইত্যে পারলম্ নাই!

এভাবেই দীর্ঘ যন্ত্রণাময় এক একটা রাত খোলা আকাশের নিচে কেটে যায় দেবকীর।

তিন

সকালবেলা সাইকেল রিপেয়ারিংয়ের দোকান খুলতে যাচ্ছিলো আকলু মাহাতো। সঙ্গে তার বাবা তারিণীও ছিলো। বৃদ্ধ তারিণী মাহাতোই দেখতে পেলো, উন্মাদ দেবকী তাঁরই ভাঙা বাড়ির উঠোনে কুণ্ডলী পাকিয়ে মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে।

আহা রে বেচারা! উয়ারে কখ্যুনো কিছু বুলবিক লাই আকলু।

কেনে পাগলা ট' ক্যে মাথ্যায় তুলছ বটে?

উয়ার লেইগ্যে হাম্যাদের রামবাঁধ কোলিয়ারি অ্যাখুনও ডাঁড়াইএ আছ্যে বটে।

আকলু জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে তাকালো বয়স আর অভিজ্ঞতার ভারে থিতু হয়ে আসা তারিণী মাহাতোর দিকে। বৃদ্ধও অতীতচারী হয়ে ওঠে—

'তিয়াত্তর সালের কথ্যা বটে। জানুয়ারি একত্রিশ। কোলিয়ারি সব লিয়ে লিল্য (অধিগ্রহণ) সরকার। রেডিঅতে ঘোষণা হোল্য। হামরা লেবরলোগ খুশ্যি। লেকিন মালিক ত খুশি লয়! উয়াদের নাফা হব্যাক লাই। রামবাঁধ খাদানের মালিক সুরজমল

উয়ার লেইঠ্যেললোগদের রাইতে ডাকলো। বুলল্য—ডুবা দো ইয়ে খাদান! অব গবরমেন্ট ক্যায়সা করকে কাম করেগা, দেখা যায়েগা!

কথা বলতে বলতে বিষাদ ভারাতুর হয়ে ওঠে তারিণী মাহাতোর গলা—'যে রাইতে সুরজমলের লেইঠ্যেললোগ বড় পুকুরের পানী রামবাঁধ খাদানের ভিত্‌তর ঢুকাইএঃ দিবার মতলবে ছিল্য, সি দিন হাম্যাদের চাকরি বাঁচল বটে দেবকীর লেইগ্যা। উ ত্য যাদা লড়ল্য বটে। লেইঠ্যেললোগ উয়ার বৌ-মেয়াকে খুন করল্য বাপ! উয়ার মাথ্যায় লোহার রড মারল। হাম্যাদের তেজী ছিল্যা ট' পাগ্যল হঁঞি গিল বাপ! উয়াকে ত হম্যাদের দেখতিই হব্যাক! হাঁ হাঁ, দেব্যকীর কেউ কুনখানে লাই! লেকিন হামরা ত আছি বটে! হামরা!

আশি বছরের বৃদ্ধ তারিণী মাহাতোর চোখদু'টো চিক্‌চিক্ করে ওঠে অশ্রুজলে।

মালভূমির ঢালে-নাবালে তখন জীবন জেগে উঠেছে। খনি-মজদুররা সকালের শিফটে কাজে যোগ দিতে সেই রাস্তা বরাবর রামবাঁধ কোলিয়ারির দিকে চলছে এখন।

দূরবর্তী ভূমি

গত পৌষে কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলায় গিয়েছিলাম। গ্রাম বাংলার মেলা, সে যেন জগৎসংসারের সারাংসার। সাধক-বাউলের লোকগান আর দেহতত্ত্বের গানে এক উদাস করা টান থাকে। ভারি ভালো লাগে। সে গান শুনলে মন পাগল-পাগল হয়ে যায়। ঘুরি ফিরি। মেলা দেখি। গান শুনি। শুকনো অজয় নদের বুকে কোথাও কোথাও টলটলে নীল জল আটকে আছে। সে জলে মাথা ডোবে না। বসে বসে ঘটি দিয়ে মাথায় জল ঢালতে হয়। শীতের সকালে গোরুর পাল হাঁটতে হাঁটতে অজয় পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠে পড়ে। আমি এইসব দেখি। সব মিলে মনটা আনচান করে ওঠে। ঈশ্বর জানি না। তবু এই পৃথিবীর হিম হিম এক সকালের সৌন্দর্য আমার মাথা নুইয়ে দেয় প্রকৃতির পদতলে। বুকের গভীর পারিপার্শ্ব থেকে জন্ম নেয় সেই বোধ, যে বোধ আমার সত্তায় নিঃশব্দে কাজ করে চলে। আনন্দ। অন্তঃস্তলে সেই সুখের শিহরন কাঁপিয়ে দিয়ে যায় আমাকে। এই অনুভব বুকে বেঁধে নিয়ে ফিরতি পথচলা শুরু করি। মুসাফির, বাঁধো গাঁঠেরি।

বাসে উঠলাম। কেঁদুলি থেকে ইলামবাজার হয়ে পানাগড় যাবো। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে সারাদিন আর রাতটা থেকে সকালের ট্রেনে ফিরে যাবো কলকাতায়। বাসের জানালা দিয়ে দেকা যাচ্ছে ধূ-ধূ মাঠ। মাঝে মাঝে সরষে খেতের হলুদ ফুল দেখছিলাম। সুখ। এই দেখাতেও সুখ। যে সুন্দরকে বুকের গভীর থেকে দেখা যায়, তাতে পার্থিব সুখ হয়, নাকি অপার্থিব? জানি না। কিন্তু বহুদূর প্রান্তরের শেষে ঘন ছায়ার অবয়ব নিয়ে যে সুখ-দুঃখের গ্রামগুলো দেখা যায়, সেদিকে

তাকিয়ে আমার বুক ঠেলে ভারী এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কেন? তা তো আমি জানি না!

দুই

ইলামবাজার থেকে বাস পাল্টে পানাগড় পৌঁছোলাম, তখন দুপুর গড়াতে আরম্ভ করেছে বিকেলের দিকে। যে গ্রাম্য সরলতা এতক্ষণ আমার চোখে স্বপ্নের মায়া মাখিয়ে দিয়েছিলো, শহরের মেয়েদের আড়চোখের সচেতন কটাক্ষ তাকে ভেঙে দিলো নিমেষেই। এ-অজয় তীরের কেঁদুলি নয়। এখানে উদাস বাউলের তত্ত্বগান নেই। এতো শহুরে জনজীবন। যেখানে শিল্পপ্রযুক্তি মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায়। অযথা আবেগ এখানে বাতুলতা। প্রেম এখানে হিসাবের মাপকাঠিতে ওঠাপড়া করে। ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রয়োজন। যাই হোক। পানাগড়ে এসে বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে কিছু সময় গেলো। রেল স্টেশনের কছেই বাড়ি। বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ ঘোষ। আমাকে দেখে সিদ্ধার্থ যতটা খুশি হয়েছে, তার থেকেও বড় কথা, অবাক হয়েছে আরো বেশি। ও ভাবতেই পারেনি, আমি চলে আসবো হঠাৎ। সে তো খুশিতে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। তারপর এতদিনের অসাক্ষাতের জমে থাকা কথার ভাণ্ডার খুলে গে া। আমাদের নাগরিক জটিলতার জীবনেও আছে মানুষ। আছে সন্ধ্যা-দুপুর রাত্রি। কংক্রিটের জঙ্গলের ঠিক ওপারেই বিরাট সেই আকাশ ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা কিংবা সন্ধ্যাতারাকে নিয়ে আলোকময় হয়ে ওঠে। প্রতিপদের চাঁদের ঢেলে দেওয়া মায়াভরা জ্যোৎস্নায় স্নান করি। তারই প্রভাবে হয়তো বা আমরা আবেগে ভেসে যাই। সুখ-অসুখের খেলা চলে মনের মধ্যে। তাই লিখতে বসি। না লিখে উপায় কি! মনের দুর্ভারকে না হলে হালকা করবো কি ভাবে?

সিদ্ধার্থ বললো, আজকে আমার ছুটি ছিলো। তাই এসেই দেখা পেলি। না হলে ভোগান্তিতে পড়তিস।

বললাম, তাতে কিছু আসতো যেতো না। পানাগড়ে এলাম যখন, যতই ভোগান্তি হোক না কেন, দেখা করেই যেতাম।

যাকগে! আজকে রাত তাহলে একটু মাংস-ফাংসো হোক। সিদ্ধার্থ বললো— এখানে কাছেই থাকেন একজন মহিলা। অল্পবয়সী বিধবা। ওনার স্বামী কোলিয়ারিতে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। একটা ছেলে আছে। সেই বৌদি আমার রান্নাটা করে দেন। চমৎকার রাঁধেন। বৌদিকে পেয়ে আমি তো বেঁচে গেছি। তাঁরও এতে খানিকটা আর্থিক সুবিধে হয়েছে। চারশো টাকা করে দিই মাসে মাসে।

ঠিক আছে। আজ তোর সঙ্গে তা হলে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

হাঁ। তার সঙ্গে খুব জম্পেশ করে না হলেও কিছুটা জম্পেশ খাওয়া-দাওয়া।

বলেই হো-হো করে হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললো সিদ্ধার্থ। ও চিরকালই প্রাণ খুলে হাসতে পারে।

তারপর তোর লেখালিখি কেমন চলছে? বল, শুনি একটু।

না লিখে পারি না। তাই লিখি। বরং বলা উচিত, এ-যুগের পক্ষে আমি একেবারেই অযোগ্য। কিছুই যখন আমার দ্বারা হবে না, অতএব লিখি।

বাঃ মাথা খাটিয়ে যুক্তি একটা ভালোই বের করেছিস তো! চমৎকার!

না না। সত্যিই তাই। এই কম্পিউটারের যুগে, অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়ার দাপাদাপি আমার মোটেই ভালো লাগে না। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সবাই যেভাবে আরো পয়সার পেছনে ছুটছে, এটা আফটার অল কতটা ভালো ফল দেবে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

খারাপ বলিসনি। দেখছি তো! মনটাকে সবাই সোনা দিয়ে মুড়ে রাখতে চাইছে। ওপরটাতো অন্তত চকচক করুক! ভেতরে অক্সিজেন গেল কি না গেল, অত জানার দরকার নেই।

হু। যা উপমা ছাড়ছিস, একবার যদি লেখালিখি শুরু করিস তো আমার ভাতও মারবি।—আমি হাসতে হাসতে বললাম।

ইস্পাত কোম্পানিতে কাজ করে কাব্যি করা হবে না আমার। তুই নিশ্চিন্তে থাকতে পারিস। ব্যস! আব ছোড়ো ইয়ার! বহুৎ গজল্লা হলো। এবার চলো। বলে সিদ্ধার্থ উঠে পড়লো।

কোথায়?

বাজারে যাবো। একটু আগে গেলে দিশি মুরগি পেয়ে যাবো। গ্রাম থেকে চাষীরা নিয়ে আসে। হেভি টেস্টি। পোলট্রির মুরগিতে আমি কোন টেস্টই পাই না।

চল বেরোই তা হলে।

তিন

সিদ্ধার্থর সঙ্গে পানাগড় স্টেশন প্লাটফর্মটা চক্কর দিলাম। স্টেশন থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে চা খেলাম। তারপর বাজারে গেলাম। সিদ্ধার্থ দেখে শুনে একটা দিশি মুরগি কিনলো। একটু এদিক ঘুরে গরম সিঙারা, মুড়ি আর ক'টা সন্দেশ কিনে নিলাম। সন্ধ্যের টিফিনটা এই দিয়েই হবে।

সিদ্ধার্থকে বললাম, দ্যাখ, আজ রাতে দিব্যি মাংস ভাত খাবো। গত চারদিন কেঁদুলির আখড়ায় আখড়ায় ভোগের প্রসাদ খেয়েছি। বিনে পয়সায় দিব্যি খাওয়া।

কেন? পয়লা লাগে না?

নাথিং। কোথাও খিচুরি আর লাবড়া তরকারি, কোথাও আতপ চালের ভাত। তার সঙ্গে টলটলে জলের মতো ডাল, আর আলু কুমড়ো বেগুন পালং বা পুঁইডাঁটা

দিয়ে ঘ্যাঁট। একেবার অমৃত। এ খাওয়া ভুলবো না কোনদিন। কেঁদুলিতে বার বার আসবো। বারবার খাবো। আর দোকানে গরম জিলিপি! ও হো! এখনো মুখে লেগে আছে।

ও মাইরি! একেবারে জিনিয়াস! তুই পারিসও বটে।

আরে ভাই, জীবনে জানা-দেখার কোন কিছুই যাবে না ফেলা।

সিদ্ধার্থর বাসায় ফিরে এলাম। মাংসের প্যাকেটটা রান্নার জায়গায় রেখে সিদ্ধার্থ ঘড়ি দেখলো।

এখন ছ'টা চল্লিশ। বৌদি সাতটা সোয়া সাতটার মধ্যে চলে আসেন। সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে রান্না নেমে যাবে। সিদ্ধার্থ ওর টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলো। প্রথম গান—'জাগরণে যায় বিভাবরী..........।'

দুই বন্ধু মিলে অনেক অনেক কথার জাল বুনে বুনে গল্প জুড়ে দিলাম। টেপ রেকর্ডারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিলো। সীমাহীন কথামালা গেঁথে তুলছিলাম আমরা। আমরা ছোটবেলার প্রাণের বন্ধু। তাই এতদিনের অদেখার পরে কথা আর ফুরোয় না। সময় এগিয়ে চললো তার নিজের ছন্দে।

চার

বহুক্ষণ বাদে হঠাৎই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো সিদ্ধার্থ।

আরে! ঘড়িতে বাজে আটটা দশ। বৌদি তো এখনো এলো না!

কোথাও আটকে গেছে। ঠিক চলে আসবে। ওদেরও তো সুবিধে-অসুবিধে আছে।

আমাকে তো জানিসই। আমি কি সেটা বুঝি না! কিন্তু বৌদি এখনো পর্যন্ত কোনদিনই লেট করেননি।

দ্যাখ না, এক্ষুনি চলে আসবে।

ন'টা। ন'টা পাঁচ। মহিলা এখনও এলেন না। সিদ্ধার্থে কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়লো।

কি করি বল তো? তুই এলি। আজকেই যতো হুজ্জুৎ!

তুই কি ভদ্রমহিলার বাড়ি চিনিস?

তা চিনি।

চল, একবার তা হলে দেখে আসি। অসুখ-বিসুখও তো হতে পারে।

ঠিক আছে। চল, দেখেই আসি।

কিন্তু আমাদের আর যেতে হলো না। একটি পাঁচ ছ'বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে তক্ষুনি মহিলা ঘরে ঢুকলেন।

ঠাকুরপো, আজ একটু দেরি হয়ে গেলো।

তাই বলে এত দেরি! আমার বন্ধু এসেছে। তাড়াতাড়ি বাজার করলাম। সব একেবারে গুবলেট হয়ে গেল। সিদ্ধার্থর গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ।

ছেলেটা কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মহিলা ছেলেকে সিদ্ধার্থর চৌকির একপাশে শুইয়ে দিয়ে শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে রান্নার কাজ শুরু করে দিলেন। কাজ করতে করতে পেছন ফিরেই কথা বলছিলেন তিনি।

আমি নিউকেন্দা কোলিয়ারিতে গিয়েছিলাম। এই দিনটাতেই খনিতে ধস নেমেছিলো। উনি আটকে—

আমার মনে হলো, মহিলা তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা আর শোক সামলানের চেষ্টা করছিলেন তখন।

সিদ্ধার্থ বা আমর কারুরই কিছু আর বলার ছিলো না। সারা ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা। কি বলবো? স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক আমরা। আমরা মধ্যবিত্ত। এঁকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে! সীমাহীন নির্লিপ্ত নিয়ে তিনি কাজ করে চললেন। ওভেনে একটায় ভাত বসিয়ে আরেকটায় ততক্ষণে প্রেসার কুকারে মাংস চাপিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরনে সাদা থান। শ্যামলা গায়ের রঙ। সুন্দর গড়ন। বড় বড় কাজল কালো চোখ দু'টোয় দারুণ নিস্পৃহতা। এঁকে সামান্য রাঁধুনি বলে মনে করার মতো দুঃসাহস অন্তত আমার মনের মধ্যে একবারও এলো না। সিদ্ধার্থ বহুক্ষণ বাদে বললো, বৌদি, আজকের দিনটার কথা আমাকে আগে বলেননি কেন?

এক পলক সিদ্ধার্থর দিকে চাইলেন তিনি। সে চোখে নিস্পৃহতা, না অবজ্ঞা, এত মানুষ ঘেঁটেও তো এখন আমি বুঝতে পারলাম না। মনে হলো, তিনি বলতে চাইছেন, যার ব্যথা, সে তারই থাক। পাড়াপড়শীকে জানিয়ে কি লাভ!

সময় আর ফুরোচ্ছিলো না। একসময় রান্না শেষ হলো। ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খাবারদাবার সব গুছিয়ে রেখে হাত-মুখ মুছে তিনি সিদ্ধার্থর কাছে এলেন।

ঠাকুরপো, রান্না শেষ। যাই! এবার আমি বেরিয়ে পড়ি। সকালে ঠিক টাইমে চলে আসবো। আপনারা, এখন ধীরে-সুস্থে খেয়ে নেবেন। এখন তাঁর মুখে মায়ের মতো হাসি। এও সেই নারী, যাঁদের মনে পরতে পর পরত দুঃখ জমলেও মুখের হাসিটা মুছে যায় না।

রাতের খাবার নিয়ে যান। রাতে খাবেন কি?—সিদ্ধার্থ বললো।

আজকের দিকে খাবার আর রুচবে না ঠাকুরপো। ছেলে তো ঘুমিয়েই পড়েছে। ও রাতে এমনিতেই কিছু খাবে না।

চলুন তা হলে। আপনাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে।

হ্যাঁ। একটু এগিয়ে দিলেই বরং ভালো হয়।

রাস্তায় যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি?

শৈল বর্মণ।

আবার চুপচাপ। ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনি হাঁটছেন। সামনে টর্চ হাতে সিদ্ধার্থ। আমি তাঁর পাশে পাশে হাঁটছি।

শ্রমিকদের বস্তি এলাকা। ছোট ছোট ইটের গাঁথনির ঘর। ওপরে টালি। তিনি তারই একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাবি বের করে ঘর খুললেন।

ঠাকুরপো, টর্চটা একটু জ্বালান তো! লন্ঠনটা বের করি।

শৈল দেশলাই ধরিয়ে লন্ঠন জ্বালালেন। তারপর আঁচলের খুঁট থেকে একটা দলাপাকানো লালচে রঙের কাগজ বের করে আমাকে বললেন, কি লেখা আছে একবার পড়ে শোনাবেন?

লন্ঠনের আলোর সামনে সেই কোঁচকানো কাগজটা আমি সমান করে পাতলাম। পড়লাম। কাঁপা কাঁপা হাতের লেখায় কয়েকটা লাইন। 'খুব অন্ধকার এখন। রাত কি দিন জানি না! আমার পাশে সতেরো জন শ্রমিক বোধ হয় সবাই মারা গেছে। কোন শব্দ নেই। জল চাই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমার বউ ছেলে'—এরপরে কাঠপেন্সিলের কিছু জড়ানো অক্ষর।—এবার শৈল কথা বললেন।

খনিতে যাঁরা মারা গিয়েছিলো, আজ তাঁদের স্মরণসভা ছিলো। আমি সকালের বাসে নিউকেন্দা কোলিয়ারিতে গিয়েছিলাম। মিটিংয়ের পরে ইউনিয়ন অফিসে ডাকলো আমায়। এই কাগজটা পাওয়া গিয়েছিলো। রেখে দাও যত্ন করে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় দরকার হবে। দেখেই চিনেছি। এ ওঁরই হাতের লেখা।

এতক্ষণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে শুরু করেছে।

আমি তো কোনদিন কয়লাখনির সুড়ঙ্গে নামিনি। সেই কঠিন অন্ধকার দেখিনি। ধসে আটকে পড়া খনি শ্রমিকের স্ত্রীপুত্রের জন্য যে যন্ত্রণা আর আর্তি, তা আমি ঠিকঠিক কী করে বুঝবো? তাই মাথা নিচু করে রইলাম। শৈল চোখ মুছে বললেন, যান, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নেবেন।

পাঁচ

সে রাতে আমরা দুই বন্ধু ভোর পর্যন্ত জেগে ছিলাম। রাতের মেল ট্রেনগুলো রেললাইন কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছিলো। আমাদের মুখে কোন কথা ছিলো না। কেন সব কথা হারিয়ে গেল, সেও আমার জানা নেই। ট্রেনগুলো যাচ্ছিলো। কাঁপছিলো মাটি, বাড়ি-ঘর। সেই দাপাদাপি আমার বুকের মধ্যে চেপে বসতে চাইছিলো।